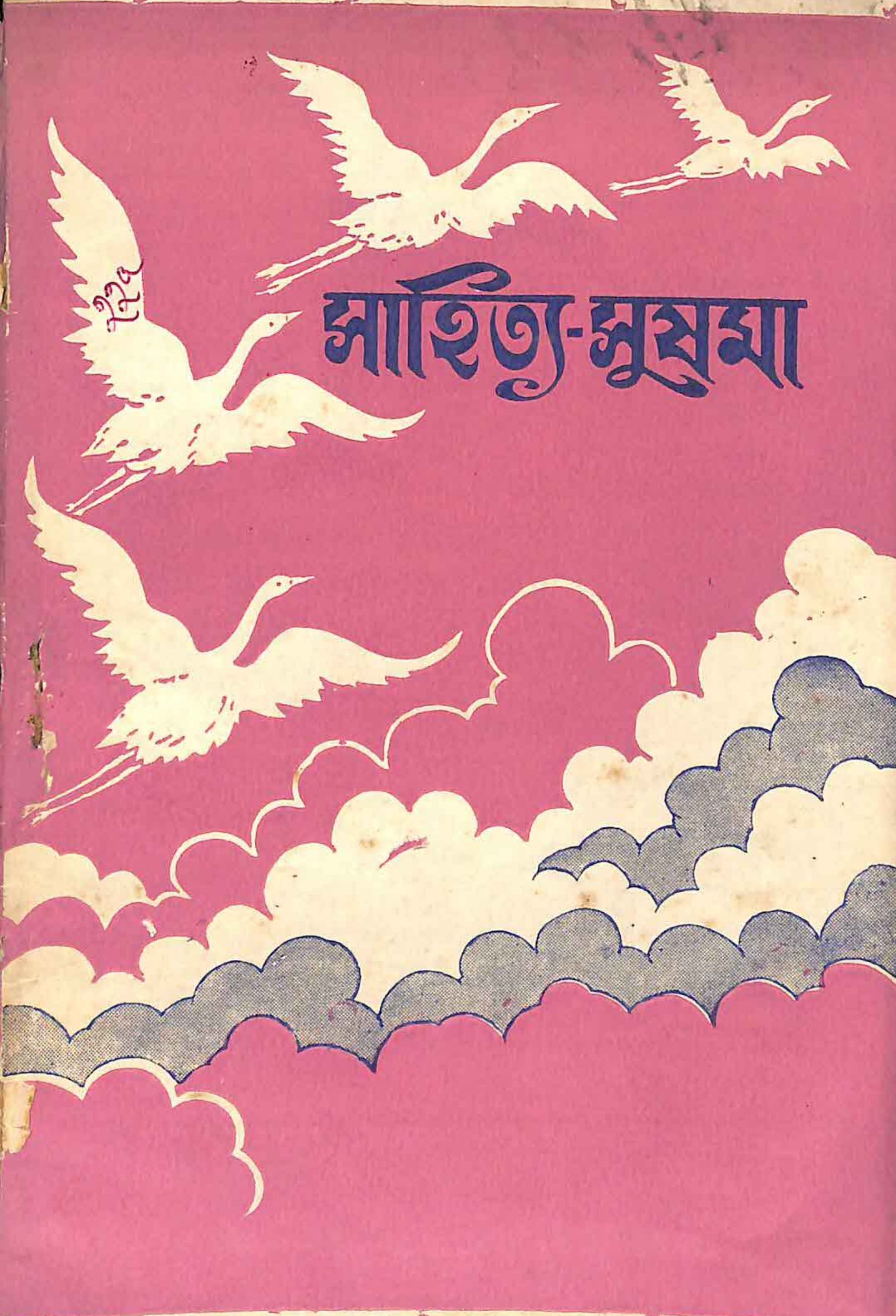
সাহিত্য-সুষমা





Recommended by the West Bengal Board of Secondary Education as a Text Book For Class VII Vide Notification No. T. B. 76/VII/T. B/120 dt. 24, 12. 76.

সাহিত্য-সুষমা

(দ্বিতীয় ভাগ)

[সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্য]

কলিকাতা রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্রসাহিত্যাদির অধ্যাপক

ডঃ শ্রীধ্যানেশ নারায়ণ চক্রবর্তী এম. এ. ডি. ফিল্.

[কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গঙ্গামণি পদক প্রাপ্ত]

এবং

শ্রীব্যোমকেশ মাইতি এম. এ. বি. টি.

মনসাদ্বীপ রামকৃষ্ণ মিশন উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহঃ প্রধান শিক্ষক

কর্তৃক

সংকলিত

নূতন সংস্করণ

প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম

প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা

৩৩ কলেজ রো • কলিকাতা ৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীনিতাই চন্দ্র ভক্ত
প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম
৩৩, কলেজ রো
কলিকাতা-৭০০০০৯

নূতন সংস্করণ ঃ জানুয়ারী ১৯৮৫

মূল্য—ছয় টাকা মাত্র

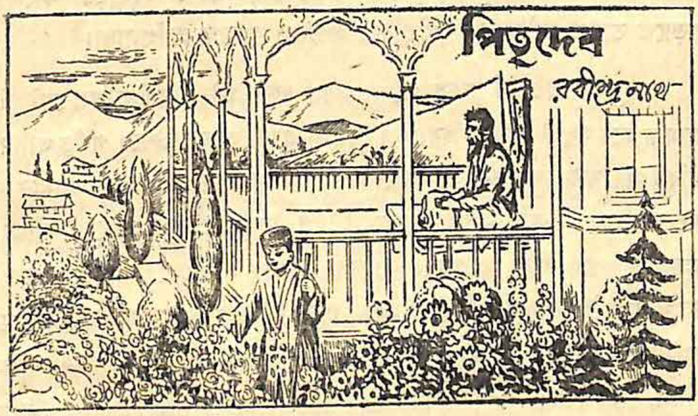
মুদ্রাকর ঃ
শ্রীমদন প্রধান
সারদামাতা প্রেস
১৬ সিমলা ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০০০৬

সূচীপত্র

[গদ্যাংশ]

[পদ্যাংশ]

—–—



[কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জীবনের স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চিত্র এইখানে অঙ্কিত করিয়াছেন। মহর্ষি পিতা কি ভাবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার মাধ্যমে শিশু পুত্রকে মহামানবে পরিণত করিবার শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহারই অনবদ্য বর্ণনা এই অংশে।]

পিতা আমার সাবধানতাবৃত্তির উন্নতি সাধনের জন্য আমার কাছে দুই-চারি আনা পয়সা রাখিয়া বলিতেন, হিসাব রাখিতে হইবে, এবং আমার প্রতি তাঁহার দামি সোনার ঘড়িটি দম দিবার ভার দিলেন। ইহাতে যে ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল সে-চিন্তা তিনি করিলেন না, আমাকে দায়িত্বে দীক্ষিত করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল। সকালে যখন বেড়াইতে বাহির হইতেন, আমাকে সঙ্গে লইতেন। পথের মধ্যে ভিক্ষুক দেখিলে, ভিক্ষা দিতে আমাকে আদেশ করিতেন। অবশেষে তাঁহার কাছে জমাখরচ মেলাইবার সময় কিছুতেই মিলিত না। একদিন তো তহবিল বাড়িয়া গেল। তিনি বলিলেন, "তোমাকেই দেখিতেছি আমার ক্যাশিয়ার রাখিতে হইবে, তোমার হাতে আমার টাকা বাড়িয়া উঠে।" তাঁহার ঘড়িতে যত্ন করিয়া নিয়মিত দম দিতাম। যত্ন কিছু প্রবল বেগেই করিতাম; ঘড়িটা অনতিকালের মধ্যেই মেরামতের জন্য কলিকাতায় পাঠাইতে হইল।

ভগবদ্‌গীতায় পিতার মনের মতো শ্লোকগুলি চিহ্নিত করা ছিল। সেইগুলি বাংলা অনুবাদ-সমেত আমাকে কপি করিতে দিয়াছিলেন। বাড়ীতে আমি নগণ্য বালক ছিলাম, এখানে আমার 'পরে এই সকল গুরুতর কাজের ভার পড়াতে তাহার গৌরবটা খুব করিয়া অনুভব করিতে লাগিলাম।

অমৃতসর যাওয়ার সময় পথের মধ্যে একটা ঘটনা ঘটিয়াছিল যেটা এখনও আমার মনে স্পষ্ট আঁকা রহিয়াছে। কোনো-একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি থামিয়াছে। টিকিট পরীক্ষক আসিয়া আমাদের টিকিট দেখিল। একবার আমার মুখের দিকে চাহিল। কী একটা সন্দেহ করিল কিন্তু বলিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পরে আর একজন আসিল; উভয়ে আমাদের গাড়ির দরজার কাছে উস্‌খুস্‌ করিয়া আবার চলিয়া গেল। তৃতীয়বারে বোধ হয় স্বয়ং স্টেশন মাস্টার আসিয়া উপস্থিত। আমার হাফ্‌টিকিট পরীক্ষা করিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "এই ছেলেটির বয়স কি বারো বছরের অধিক নহে!" পিতা কহিলেন, "না।" তখন আমার বয়স এগারো। বয়সের চেয়ে নিশ্চয়ই আমার বৃদ্ধি কিছু বেশি হইয়াছিল। স্টেশন মাস্টার কহিল, "ইহার জন্য পুরা ভাড়া দিতে হইবে।" আমার পিতার দুই চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। তিনি বাক্স হইতে তখনই নোট বাহির করিয়া দিলেন। ভাড়ার টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকা যখন তাহারা ফিরাইয়া দিতে আসিল তিনি সে টাকা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন, তাহা প্ল্যাটফর্মের পাথরের মেজের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া ঝন্‌ ঝন্‌ করিয়া বাজিয়া উঠিল। স্টেশন মাস্টার অত্যন্ত সংকুচিত হইয়া চলিয়া গেল; টাকা বাঁচাইবার জন্য পিতা যে মিথ্যা কথা বলিবেন, এ সন্দেহের ক্ষুদ্রতা তাঁহার মাথা হেঁট করিয়া দিল।

অমৃতসরে গুরুদরবার আমার স্বপ্নের মতো মনে পড়ে। অনেকদিন সকাল-বেলায় পিতৃদেবের সঙ্গে পদব্রজে সেই সরোবরের মাঝখানে শিখ-মন্দিরে গিয়াছি। সেখানে নিয়তই ভজনা চলিতেছে। আমার পিতা সেই শিখ-উপাসকদের মাঝখানে বসিয়া সহসা এক সময়ে সুর করিয়া তাহাদের ভজনায় যোগ দিতেন; বিদেশীর মুখে তাহাদের এই বন্দনাগান শুনিয়া তাহারা অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়া উঠিয়া তাঁহাকে সমাদর করিত। ফিরিবার সময় মিছরির খণ্ড ও হালুয়া লইয়া আসিতেন।

যখন সন্ধ্যা হইয়া আসিত পিতা বাগানের সম্মুখে বারান্দায় আসিয়া বসিতেন। তখন তাঁহাকে ব্রহ্মসংগীত শোনাইবার জন্য আমার ডাক পড়িত। চাঁদ উঠিয়াছে, গাছের ছায়ার ভিতর দিয়া জ্যোৎস্নার আলো বারান্দার উপর আসিয়া পড়িয়াছে, আমি বেহাগে গান গাহিতেছি—

তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে,
কে সহায় ভব-অন্ধকারে।

তিনি নিস্তব্ধ হইয়া নতশিরে কোলের উপর দুই হাত জোড় করিয়া শুনিতেছেন—সেই সন্ধ্যাবেলাটির ছবি আজও মনে পড়িতেছে।...

আমার শোবার ঘর ছিল একটা প্রান্তের ঘর। রাত্রে বিছানায় শুইয়া কাচের জানালার ভিতর দিয়া নক্ষত্রালোকের অস্পষ্টতায় পর্বতচূড়ার পাণ্ডুরবর্ণ তুষারদীপ্তি দেখিতে পাইতাম। এক একদিন, জানিনা কত রাত্রে, দেখিতাম, পিতা গায়ে একখানি লাল শাল পরিয়া হাতে একটি মোমবাতির সেজ লইয়া নিঃশব্দ সঞ্চরণে চলিয়াছেন। কাচের আবরণে ঘেরা বাইরের বারান্দায় বসিয়া উপাসনা করিতে যাইতেছেন।

তাহার পর আর এক ঘুমের পরে হঠাৎ দেখিতাম, পিতা আমাকে ঠেলিয়া জাগাইয়া দিতেছেন। তখনো রাত্রির অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর হয় নাই। উপক্রমণিকা হইতে "নরঃ নরৌ নরাঃ" মুখস্থ করিবার জন্য আমার সেই সময় নির্দিষ্ট ছিল। শীতের কম্বলরাশির তপ্ত বেষ্টন হইতে বড়ো দুঃখের এই উদ্‌বোধন।

সূর্যোদয়কালে যখন পিতৃদেব তাঁহার প্রভাতের উপাসনা অন্তে এক বাটি দুধ খাওয়া শেষ করিতেন, তখন আমাকে পাশে লইয়া দাঁড়াইয়া উপনিষদের মন্ত্রপাঠ দ্বারা আর একবার উপাসনা করিতেন। তাহার পরে আমাকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইতেন। তাঁহার সঙ্গে বেড়াইতে আমি পারিব কেন অনেক বয়স্ক লোকেরও সে সাধ্য ছিল না। আমি পথিমধ্যেই কোনো একটা জায়গায় ভঙ্গ দিয়া পায়ে-চলা পথ বাহিয়া উঠিয়া আমাদের বাড়িতে গিয়া উপস্থিত হইতাম।

পিতা ফিরিয়া আসিলে ঘণ্টাখানেক ইংরেজী পড়া চলিত। তাহার পর দশটার সময় বরফগলা ঠাণ্ডা জলে স্নান। ইহা হইতে কোনোমতেই অব্যাহতি ছিল না ; তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে ঘড়ায় গরমজল মিশাইতেও ভৃত্যেরা কেহ সাহস করিত না। যৌবনকালে তিনি নিজে কিরূপ দুঃসহশীতল জলে স্নান করিয়াছেন, আমাকে উৎসাহ দিবার জন্য সেই গল্প করিতেন।

এক-একদিন দুপুরবেলায় লাঠি হাতে একলা এক পাহাড় হইতে আর-এক পাহাড়ে চলিয়া যাইতাম ; পিতা তাহাতে কখনো উদবেগ প্রকাশ করিতেন না।

আমার যৌবনারম্ভে এক সময়ে আমার খেয়াল গিয়াছিল আমি গোরুর গাড়িতে করিয়া গ্রাণ্ড্ট্রাঙ্ক রোড ধরিয়া পেশোয়ার পর্যন্ত যাইব। আমার এ প্রস্তাব কেহ অনুমোদন করেন নাই এবং ইহাতে আপত্তির বিষয় অনেক ছিল। কিন্তু, আমর পিতাকে যখনই বলিলাম তিনি বলিলেন, "এতো খুব ভালো কথা : রেলগাড়িতে ভ্রমনণকে কি ভ্রমণ বলে।" এই বলিয়া তিনি কিরূপে পদব্রজে এবং ঘোড়ার গাড়ি প্রভৃতি বাহনে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহার গল্প করিলেন। আমার যে ইহাতে কোনো কষ্ট বা বিপদ ঘটিতে পারে, তাহার উল্লেখমাত্র করিলেন না।

যেমন করিয়া তিনি পাহাড়ে-পর্বতে আমাকে একলা বেড়াইতে দিয়াছেন, সত্যের পথেও তেমনি করিয়া চিরদিন তিনি আপন গম্যস্থান নির্ণয় করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন। ভুল করিব বলিয়া তিনি ভয় পান নাই, কষ্ট পাইব বলিয়া তিনি উদ্বিগ্ন হন নাই। তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু শাসনের দণ্ড উদ্যত করেন নাই।

অনুশীলনী

১। রবীন্দ্রনাথকে পিতা কিভাবে শিক্ষা দিতেন বর্ণনা কর।

২। শিশু রবীন্দ্রনাথকে উপলক্ষ্য করিয়া মহর্ষির তেজস্বিতা ও সত্যনিষ্ঠার একটি ঘটনা বর্ণনা কর।

৩। কিভাবে গীতাপাঠে এবং প্রার্থনায় পুত্রকে মহর্ষি উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা কর।

৪। পুত্রের সঙ্গীতপ্রতিভা বিকাশে মহর্ষির উৎসাহদানের ঘটনা বিবৃত কর।

৫। ব্যাখ্যা কর ঃ (ক) তিনি আমাদের সম্মুখে জীবনের আদর্শ ধরিয়াছিলেন, কিন্তু শাসনের দন্ড উদ্যত করেন নাই।

(খ) তুমি বিনা কে প্রভু সংকট নিবারে
কে সহায় তব অন্ধকারে।

৬। অর্থ লিখ ঃ—তুষার, নিস্তব্ধ, অভিপ্রায়ে, সঞ্চরণ।

৭। পরিচয় দাও ঃ—গীতা, উপক্রমণিকা, উপনিষদ্, অমৃতসর।



[বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে শ্রীপ্রবোধ কুমার সান্যাল একজন দিক্‌পাল। তিনি জন্ম পরিব্রাজক। পথের সহস্র দুঃখ কষ্ট উপেক্ষা করিয়া হিমালয়ের দুর্গম তীর্থে তাঁহার ভ্রমণের শেষ নাই। 'কেদার দর্শনে, তিনি কেদারতীর্থ' ভ্রমণের বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা বলিয়াছেন।]

আকাশ ঘন মেঘ ও কুয়াশায় প্রায় অন্ধকার। শোনা গেল বৎসরে কোনো কোনো দিন মাত্র এ-রাজ্যে সূর্যকিরণ দেখা যায়। সম্মুখে সাদা তুষারময় পর্বতের কোলে কোলে মেঘ ভেসে চলেছে। ঠাণ্ডায় পা ঠিক পড়ছেনা, মাতালের মতো ছন্দহীন হয়ে চলেছি! দাঁতের উপর দাঁত চেপে জমাট বেঁধে যাচ্ছে। মুখে চোখে ছুঁচের মতো তুষারের হাওয়া বিঁধচে, লাঠিটা বাগিয়ে ধরতে পারছিনে। পাকদণ্ডী পাহাড়ের পথ, দীর্ঘলম্বা চড়াই নয়, গোলক-ধাঁধাঁর মতো ঘুরে ঘুরে উপরে উঠছি, বুকের মধ্যে দম আছে প্রচুর, কিন্তু পা ক্লান্ত হচ্ছে। একটু দাঁড়িয়ে আবার উঠতে থাকি। আজ আমি আগে আগে, ব্যথা নেই, ক্লান্তি নেই, উৎসাহহীন নই, পিছনের পথ কুয়াশায় অবলুপ্ত, সম্মুখে হিমালয়ের অনন্ত কুহেলিকা, পথের ধারে ধারে বরফের স্তূপ জমাট বেঁধে রয়েছে, ঝর্ণাগুলি সাবানের ফেনার মতো গলে পড়ছে—আজ আমি আগে আগে। আজ আমার শরীরে ফিরে এসেছে পুরাতন শক্তি, বলিষ্ঠতা, দুরন্ত উদ্দীপনা, অপরিমেয় প্রাণলীলা।

...ছুটতে ছুটতে সকলকে পিছনে ফেলে এসেছি। চারিদিকে অকূল কুয়াশার মধ্যে সঙ্গীরা কে কোথায় হারিয়ে গেছে, কেবল দেখা যাচ্ছে দুইদিকের সামান্য পথরেখা। কোথাও বৃক্ষলতা নেই, বন অরণ্য নেই, জীব-জানোয়ারের চিহ্নমাত্র নেই, শুধু তুষারময় পর্বতমালা অসংখ্য ঝর্ণা চীৎকার করতে করতে পথের ধারে নেমে আসছে। বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পিছনে মেঘের ঘনঘটা, বিলুপ্ত আকাশ, নিশ্চিহ্ন পৃথিবী। এবার চল্‌ছি হাতড়ে হাতড়ে, গর্জনমত্ত বায়ুবেগে আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছিনে। ক্রমে ক্রমে আলো প্রখর হ'য়ে উঠলো। সে আলো আকাশের নয়, রৌদ্রের দীপ্তির নয়, বিদ্যুৎবহ্নির নয়, সে—এক নতুন অলৌকিক আলো—তুষার-শুভ্রতার তীব্র তীক্ষ্ণ আলো। আলোর স্রোত, আলোর সমুদ্র, আলোক ধাঁ-ধাঁ। চোখের দৃষ্টি উগ্র যন্ত্রণায় বুজে এল, চোখ জুড়ে বন্ধ হয়ে গেল। চোখে হাত চাপা দিয়ে অন্ধের মতো সংকীর্ণ পথরেখার উপরে পা বুলিয়ে বুলিয়ে হাঁট্‌ছি। সে কী ভয়ানক সর্বনাশা আলোকের উগ্রতা, তীরের মতো চোখে এসে লাগে, যাত্রীরা পথভ্রষ্ট হয়ে হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ে যায়। দেখতে দেখতে আবার নূতন উপসর্গ দেখা দিল। উঠলো ঝড়, ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে শিউলি ফুলের মতো তুষার বৃষ্টি। কী কঠিন ঠাণ্ডা! আঃ, আর বুঝি আত্মরক্ষা হ'লো না, আর কতদূর আছে কে জানে,—মন্দির আর কতদূরে? মাথার উপরে পড়ছে বরফ, কাঁধে পড়ছে বরফ, কম্বলটা বরফে সাদা হয়ে গেল, চোখে চাপা দিয়েও চোখ খুলতে পারছিনে, পাগলের মতো ছোটবার চেষ্টা করলাম।

"আঁক্‌!"

পড়লাম পা পিছ্‌লে বরফের উপরে, পথ তুষারে ডুবে গেছে। যাক এ যাত্রা বেঁচে গেলাম। কোমর পর্যন্ত ঠাণ্ডা উঠে পক্ষাঘাত হয়েছে, ঊর্ধ্ব দেহটা কেবল বাকি। নিজেকে টানতে টানতে এগোচ্ছি, মিট মিট করে একবার তাকাবার চেষ্টা করলাম। সম্মুখে তুষারের পুষ্পবৃষ্টি রূপার ঝালরের মতো ঝলমল করচে, মাথার উপরে তুষারের চন্দ্রাতপ। কী অনির্বচনীয় রূপগৌরব! এ যেন কোন্‌ বিরাটের পদতল ছোঁবার জন্য উঠছি, যেন এক বিপুল বিশ্বের তোরণদ্বারে করাঘাত করবার জন্য পাগলের মতো, অন্ধের মতো হাত্‌ড়ে চল্‌ছি—যেন স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের আজ আলিঙ্গন হবে।

শঙ্খধ্বনি শুনছি। কাঁসর-ঘণ্টার বুঝি আওয়াজ আসছে! কোন্ দিকে? উত্তরে, না দক্ষিণে? আবার কান পেতে শুনলাম! কাঁসর-ঘণ্টার শব্দ অদূরে আবার শোনা গেল। দু'চারজন যাত্রী দূরে ছায়ার মতো নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। মন্দাকিনী—দুধগঙ্গার পুল পার হয়েই সামান্য লোকালয় ও কয়েকটা পাথরের ঘর, দু' একটি দোকান, পথগুলি পাথরে বাঁধানো। ঘর-দুয়ার, দোকান-পাট, পথ-ঘাট সমস্ত কঠিন বরফের স্তূপে ঢাকা। তার উপর দিয়েই আনাগোনা চলছে! খবর নিয়ে জানলাম গোপালদার দল এখনো অনেক পিছনে।

পথ ঘুরেই সম্মুখে তুষারময় হিমালয়ের পটভূমিকায় কেদারনাথের মন্দির দেখা গেল। সম্মুখে প্রস্তরময় বেদিকার উপরে পথের দিকে পিছন ফিরে বিরাট পাথরের ষাঁড় উপবিষ্ট। চোখে বরফের আলো এতক্ষণে একটু সয়ে গেছে, এবারে আর তেমন কষ্ট হচ্ছে না। এবারে হাতের দিকে তাকিয়ে দেখি আঙুলের ডগাগুলো ঠাণ্ডায় ফেটে গিয়ে রক্ত ঝরছে, পায়ের চামড়া ফেটে গেছে। তা যাক্ বাইরে পাদুকা ত্যাগ করে এই পরম রূপবান মন্দিরের ঘনান্ধকার অন্দরে তাড়াতাড়ি প্রবেশ করলাম। ভিতরে তখন জনকয়েক অর্ধ উন্মত্ত স্ত্রীপুরুষ যাত্রী কেদারনাথের বিপুল দেহের উপর ওলটপালট খাচ্ছে। কেদারনাথ মূর্তিমান নন্, কর্কশ অসমতল বড় একখানা পাথরের খণ্ড,—তা হোক, তাকেই আলিঙ্গন করে কেউ হাসছে, কেউ কাঁদছে, কেউ চীৎকার করছে, কেউ ধরেছে গান, কেউ করছে আর্তনাদ ও করুণ মিনতি, কেউ বা শীত বিদীর্ণ রক্তাক্ত মুখে তাকে পাগলের মতো চুম্বন করছে। আবেগ, উত্তেজনা, উল্লাস, আর্তস্বর, পূজাপাঠ, স্তব-মন্ত্র, স্নেহ-ভালোবাসা, ভক্তি ও আনন্দ,—কিন্তু স্থানু ও বধির প্রস্তরস্তূপ অচঞ্চল নীরবতায় তেমনি করেই পড়ে রইলো। ভিতরটায় কালিবর্ণ অন্ধকার ও কঠিন অসহ্য প্রাণান্তিক ঠাণ্ডা, পা পেতে দাঁড়াবার উপায় নেই সম্মুখে এই পথশ্রান্ত পাগলের দল আত্মহারা হয়ে কোলাহল করছে! কী যেন ভেবে অন্ধকারে একবার নিঃশব্দে দাঁড়ালাম।

কিন্তু ভিতরের হিমগর্ভ অন্ধকারের মধ্যে স্থির হ'য়ে দাঁড়াবার উপায় নেই, ঠাণ্ডায় মুহূর্তে মুহূর্তে সর্বশরীর অসাড় হয়ে আসে, গায়ের রক্ত জমাট বেঁধে যায়,…অন্ধকারের ভিতর থেকে পা বুলিয়ে বুলিয়ে দরজা দিয়ে বার হয়ে এলাম। হাত, পা, মুখ, ঠাণ্ডায় বেঁকে যাচ্ছে, নেমে এসে কোনক্রমে জুতো জোড়া পায়ে ঢুকিয়ে ছুটতে-ছুটতে চললাম। হাতে লাঠি, তাকে চালনা

করার আর শক্তি নেই, পায়ের তলায় বরফের চাপড়াগুলিতে মচ মচ করে শব্দ হচ্ছে, অন্ধকার থেকে তুষারের আলোয় নেমে আবার চোখ বুজে আসছে—মুখে একরকম শব্দ করতে করতে এসে ধর্মশালায় উঠলাম।

অনুশীলনী

১। কেদার যাত্রার বিচিত্র অভিজ্ঞতার পরিচয় দাও।

২। লেখকের কেদার দর্শন বর্ণনা কর।

৩। হিমালয় প্রকৃতির দুর্গমতা ও সৌন্দর্যের পরিচয় দাও।

৪। 'সে এক নতুন আলৌকিক আলো'—

এখানে কোন্ আলোর কথা বলা হইয়াছে? আলোর স্বরূপ বর্ণনা কর।

৫। ব্যাখ্যা কর ঃ—

(ক) এ যেন কোন্ বিরাটের পদতলে ছোঁবার জন্য উঠছি...মর্ত্যের আজ আলিঙ্গন হবে।

(খ) আবেগ, উত্তেজনা, উল্লাস, আর্তস্বর...তেমনি করেই পড়ে রইল।

৬। অর্থ লিখ ঃ—

গোলক ধাঁধাঁ, কুহেলিকা, অপরিমেয়, ঘনঘটা, উপসর্গ, মোলায়েম, চন্দ্রাতপ, স্থানু।

৭। বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ—ঘর দুয়ার, হিমগর্ভ, চমচম, করাঘাত, উগ্র, উপসর্গ, ঘনঘটা, তুষারময়, অপরিমেয়।

৮। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ঃ—

ছন্দহীন, তুষার শুভ্র, পথভ্রষ্ট, তুষার-বৃষ্টি, শীত বিদীর্ণ পথঘাট।

৯। পদ পরিবর্তন কর ঃ—

সমুদ্র, পৃথিবী, কঠিন, অরণ্য, উপবিষ্ট, উত্তেজনা, উল্লাস।

আমাদের মাতৃভূমি

স্বামী বিবেকানন্দ

স্বামী বিবেকানন্দ একজন দেশপ্রেমিক বৈদান্তিক সন্ন্যাসী। মাতৃভুমির প্রতি ছিল তাঁহার সুগভীর ভালবাসা। এই প্রবন্ধে বিশ্ব সভ্যতার ভারতের অবদানের কথা আবেগদীপ্ত ভাষায় উল্লিখিত হইয়াছে।]

আমাদের পবিত্র মাতৃভূমি ধর্ম ও দর্শনের দেশ—ধর্মবীরগণের জন্মস্থান, ত্যাগের ক্ষেত্র। শুধু এই দেশেই সুদূর অতীত হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত মানব জীবনের মহত্তম আদর্শগুলি বিদ্যমান রহিয়াছে। তত্ত্বদৃষ্টি, ভগবৎপরায়ণতা এবং নীতি-বিজ্ঞানের প্রসূতি এই ভারত মাধুর্য, কোমলতা ও মানব প্রীতির-আকর।

এই সেই ভারত, যাহা বহু শতাব্দীর ঘাত-প্রতিঘাত, শত শত বৈদেশিক আক্রমণ, শত শত অভিনব সামাজিক প্রথা ও আচারের আবির্ভাব সত্ত্বেও এখনও বাঁচিয়া আছে। সত্যই ভারতের জীবন অমর, প্রাণ-শক্তি অফুরন্ত! ইহা ভূপৃষ্ঠের যে-কোন পর্বত অপেক্ষাও অটল। বস্তুতঃ ভারতের জীবন আত্মারই মত অনাদি, অনন্ত ও অনির্বাণ।

এমনই দেশের সন্তান আমরা। যখন গ্রীসের জন্ম হয় নাই, রোমের কথা কেহ ভাবে নাই, বর্তমান ইউরোপীয়দের পূর্বপুরুষগণ বিচিত্র অঙ্গরাগে রঞ্জিত অসভ্য অরণ্যবাসী মাত্র ছিল, সেই সুদূর যুগেও ভারত তাহার সংস্কৃতির সাধনায় কর্মমুখর।

জগতের ইতিহাস পর্যালোচনা কর—যেখানেই কোন সুমহান আদর্শের সন্ধান মিলিবে, দেখিতে পাইবে উহার জন্ম ভারতবর্ষে। স্মরণাতীত কাল হইতে ভারত মানব সমাজের কাছে অমূল্য ভাবসমূহের খনিস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় উচ্চ ভাবরাশি আহরণ করিয়া সে সারা জগতে মুক্তহস্তে ঐগুলি বিলাইয়া দিয়াছে। ধর্মীয় গবেষণায় আমরা জানিতে পারি যে, যে-কোন দেশেই উত্তম নৈতিক বিধান প্রচলিত আছে। উহার জন্য ঐদেশ অন্ততঃ আংশিকভাবে ভারতের কাছে ঋণী; আর আত্মার অমরত্ব সম্বন্ধে যদি কোন ধর্মে সুষ্ঠু ধারণা থাকে, তাহা হইলে উহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে ভারত হইতেই গৃহীত। বস্তুতঃ এই দেশ হইতে দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক ভাব-তরঙ্গ

উচ্ছলিত হইয়া বারবার জগৎ প্লাবিত করিয়াছে। পুনরায় ভারতবর্ষ হইতে ঐরূপ এক মহাপ্লাবন নির্গত হইয়া মুমূর্ষু জাতিগুলির অন্তরে নূতন জীবন ও বলবীর্যের সঞ্চার করিবে। সত্যই আমাদের মাতৃভূমির কাছে জগতের ঋণ অপরিসীম। ধীরপ্রকৃতি নিরীহ ভারতবাসীর কাছে জগৎ যত উপকৃত হইয়াছে তেমন অপর কোন জাতির কাজে নহে। প্রভাতের কোমল শিশিরকণা যেমন লোক চক্ষুর অন্তরালে মনোরম গোলাপের কুঁড়িগুলিকে ফুটাইয়া তুলে, বিশ্ব-চিন্তাধারায় ভারতের অবদানও ঠিক সেইরূপ। অব্যর্থ ফলপ্রসূ ভারতীয় ভাবপুঞ্জের নীরব অলক্ষ্য প্রভাব বৈদেশিক চিন্তাজগতে কতবার বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনিয়াছে! কেহ কখনও তাহা জানিতেও পারে নাই।

প্রাচীন এবং আধুনিক কালে বহু শক্তিশালী খ্যাতনামা জাতি অনেক উচ্চভাব প্রচার করিয়াছে সত্য। সমুন্নত জাতীয় জীবনের উদ্বেল প্রবাহে শক্তিশালী সত্যের বীজসমূহ চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এইভাবে এইসব ভাব এক জাতি হইতে অন্য জাতিতে সংক্রমিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, ইহা ঘটিয়াছে যুদ্ধের তূর্যধ্বনির সঙ্গে, রণোন্মত্ত সেনাবাহিনীর অভিযানের মাধ্যমে, প্রত্যেকটি ভাব যেন রক্তের বন্যার মধ্য দিয়া—লক্ষ লক্ষ মানুষের শোণিত ঠেলিয়া—অগ্রসর হইয়াছে। শক্তিশালী বিজেতার এক একটি আদেশের ফলে উঠিয়াছে লক্ষ লক্ষ আর্তের চিৎকার, অনাথ শিশুর ক্রন্দন এবং নিরাশ্রয় বিধবার আকুল অশ্রুপাত। অন্যান্য জাতির ভাব প্রচার হইয়াছে প্রধানতঃ এইভাবেই। বহু সহস্র বৎসরের ভারতীয় জীবন কিন্তু বিবাদ-বিসংবাদহীন নিবিড় শান্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

এখন কোন দেশের কথা কি কখনও শুনিয়াছ, যেখানে শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ কোন পরাক্রান্ত নৃপতি বা প্রাচীন দুর্গবাসী দস্যু-জমিদারের পরিবর্তে বনবাসী অর্ধনগ্ন তাপসদের বংশধর বলিয়া নিজেদের পরিচয় দিতে কুণ্ঠাবোধ করেন না? —সেই দেশ এই ভারতবর্ষ। পৃথিবীতে যত গর্বিত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছে আমি তাহাদের অন্যতম। কিন্তু স্পষ্ট বলিতেছি, সেই গর্ব আমার নিজের দরুণ নহে—উহা আমার পূর্বপুরুষগণকে লইয়া। যতই আমি অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করিয়াছি, যতই আমি পশ্চাতের দিকে তাকাইয়াছি, ততই এই গর্ব আমাকে পাইয়া বসিয়াছে এবং ইহাই আমার দৃঢ় প্রত্যয়ের তেজ ও সৎসাহস সঞ্চার করিয়াছে;

ইহাই ধরণীর ধূলি হইতে আমাকে উর্ধ্বে তুলিয়া আমাদের ত্রিকালদর্শী পূর্ব-পুরুষগণের পরিকল্পনা সফল করিতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। হে সনাতন আর্য-ঋষির সন্তানগণ। বিধাতার কৃপায় তোমরাও যেন অনুরূপ গর্ববোধ কর, তোমাদের শোণিত প্রবাহে যেন পূর্বপুরুষগণের উপর ঐ প্রকার শ্রদ্ধা সংক্রমিত হয়। —যেন উহা তোমাদের জীবনের প্রধান উপাদান হইয়া বিশ্বের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। মনে রাখিও যে, এই ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যেই আছে সেই শক্তিপ্রদ অমৃত প্রস্রবণ যাহা জড়বাদের সর্বগ্রাসী অগ্নিকে নির্বাপিত করিয়া কোটি কোটি বিশ্ববাসীর হৃদয়ের জ্বালা ঘুচাইতে সক্ষম।

অনুশীলনী

১। বিশ্বসভ্যতায় ভারতের অবদানের উল্লেখ কর।

২। ভারতের মহিমা বর্ণনা কর।

৩। 'অন্যান্য জাতির ভাব প্রচার হইয়াছে প্রধানতঃ এই ভাবেই'। অন্যান্য জাতি কিভাবে ভাব প্রচার করিয়াছেন? এই বিষয়ে ভারতবাসীর সহিত্ ইহাদের পার্থক্য বুঝাইয়া বল।

৪। 'সত্যই আমাদের মাতৃভূমির কাছে জগতের ঋণ অপরিসীম'।

'আমাদের মাতৃভূমি' কোন্ দেশ? ইহার নিকট পৃথিবী কোন্ কোন্ বিষয়ে ঋণী।

৫। 'পৃথিবীতে যত গর্বিত লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন আমি তাঁহাদের অন্যতম,—একথা কে বলিয়াছেন? এই গর্বের হেতু কি? বক্তার নিজের উপর ইহার প্রভাব বর্ণনা কর।

৬। ব্যাখ্যা লিখ ঃ

(ক) প্রভাতের কোমল শিশির কণা যেমন লোকচক্ষুর অন্তরালে মনোরম গোলাপের কুঁড়িগুলিকে ফুটাইয়া তুলে, বিশ্ব-চিন্তাধারায় ভারতের অবদানও ঠিক সেইরূপ।

(খ) এই ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যেই আছে সেই শক্তিপ্রদ অমৃত প্রস্রবণ যাহা জড়বাদের সর্বগ্রাসী অগ্নিকে নির্বাপিত করিয়া কোটি কোটি বিশ্ববাসীর হৃদয়ের জ্বালা ঘুচাইতে সক্ষম।

৭। টীকা লিখ : ধর্ম, দর্শন, গ্রীস, রোম, ইউরোপ, নীতি-বিজ্ঞান, জড়বাদ

৮। অর্থ লিখ : ধর্মবীর, তত্ত্বদৃষ্টি, আকার, অনির্বাণ, অঙ্গরাগ, অবদান, উদ্বেল প্রবাহ, তুর্যধ্বনি ত্রিকালদর্শী, সনাতন, অমৃত-প্রস্রবণ।

৯। বাক্যে ব্যবহার কর : ঘাত-প্রতিঘাত, অফুরন্ত, কর্মমুখর, স্বতঃস্ফূর্ত, মুমূর্ষু, ফলপ্রসূ।

১০। সন্ধি বিচ্ছেদ কর : প্রত্যক্ষ, নীরব, সমুন্নত, পর্যালোচনা।

১১। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ : অনন্ত, আবির্ভাব, সক্ষম, খ্যাতনামা, অন্তরালে, বিধবা, বিজেতা।

১২। শূন্যস্থান পূরণ কর : শক্তিশালী—এক একটি আদেশের ফলে লক্ষ লক্ষ—চিৎকার,—শিশুর—এবং বিধবার—অশ্রুপাত।



[সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক ধীরেন্দ্রলাল ধরের আমাদের 'গান্ধীজী' গ্রন্থ ইইতে এই প্রবন্ধটি সংকলিত। ১৯৩০ সাল ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে এক স্মরণীয় কাল। ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ মহাত্মাগান্ধী দাণ্ডি অভিযান করিয়া পশ্চিম সমুদ্রতীরে লবণ তৈয়ারি করেন, তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া সমগ্র দেশে 'আইন অমান্য' আন্দোলন সুরু হয়। এখানে সেই ঐতিহাসিক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে।]

সবরমতী আশ্রমের শীর্ণ সন্ন্যাসীর কপালে জাগলো চিন্তার রেখা। চল্লিশ কোটি নরনারীর অন্নবস্ত্রের স্বাচ্ছন্দ্য, মানুষের মত বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা, কোন্ পথে সার্থক হয়ে উঠবে তাই তিনি ভাবতে বসলেন। সত্য ও অহিংসার পথই তাঁর পথ, সেই পথেই মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের সাধনা করতে হবে। মৃত্যুভয়াল কালবৈশাখীর সামনে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে হবে, অসত্যকে সত্য দিয়ে জয় করতে হবে, অন্যায়কে আঘাত করতে হবে, ভয় পেলে তো চলবে না। সন্ন্যাসীর তৃতীয় নয়ন উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, সত্য-সেবীর আত্মনিবেদন ভারতের আকাশে বাতাসে মূর্ছনা তুললো—'অন্য জাতির স্বাধীনতা অর্জনের নীতি ভিন্ন হতে পারে, কিন্তু ভারতবাসীর কাছে একটি মাত্র পথ খোলা আছে, তা অহিংস অসহযোগের পথ, স্বরাজলাভের জন্য তোমরা সেই মন্ত্রের উদ্গাতা হও, ঈশ্বর তোমাদের সাহস দিন, শক্তি দিন, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তোমরা যেন সর্বস্ব পণ করে অবতীর্ণ হতে পার।'

মহাত্মাজী বড়লাটের কাছে চিঠি লিখলেন—

বন্ধু, ভারতের বুকে বৃটিশ শাসন একটি অভিশাপ। এই শাসন-ব্যবস্থা আমাদের দাসজাতিতে পরিণত করেছে। আমাদের কৃষ্টির মূলে আঘাত করেছে, আমাদের ধর্মনীতিকে অবনত করেছে।......বৃটিশ শাসনে যে সব দুর্নীতি পুঞ্জীভূত হয়েছে তা দূর করার জন্য আমি আপনাকে অনুরোধ করছি। কিন্তু আমার এই অনুরোধ যদি আনপার অন্তর স্পর্শ করতে না পারে তাহলে আগামী ১১ই মার্চ তারিখে আমার আশ্রমিক সহকর্মীদের নিয়ে আমি লবণ আইন অমান্য করার জন্য অভিযান করবো। আপনি মনে করলে তার আগেই আমাকে গ্রেপ্তার করতে পারেন কিন্তু আমি আশা করি হাজার হাজার কর্মী আমার আরব্ধ কাজকে সম্পূর্ণ করার জন্য এগিয়ে আসবে! ...এ সম্পর্কে যদি আপনি ঘরোয়াভাবে আলোচনা করতে চান, আমি রাজী আছি।...

চিঠিখানি বড়লাটের কাছে নিয়ে গেলেন গান্ধী আশ্রমের এক ইংরাজ যুবক—রেজিন্যাল্ড্ রেণল্ড।

বড়লাট উত্তর দিলেন—গান্ধিজী এমন এক কার্যক্রম ঠিক করেছেন যার ফলে জনসাধারণের শান্তি বিপন্ন হবে, এজন্য আমি দুঃখিত······

ইংরাজী ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ। সকাল সাড়ে ছ'টার সময় একষট্টি বছরের বৃদ্ধ সবরমতীর নদীতীরে এসে দাঁড়ালেন। পরনে কটিবাস, হাতে একগাছি লাঠি, সঙ্গে ঊনআশি জন আশ্রমিক অনুচর—ষোল বছরের ছেলেও সে দলে আছে, তাঁতী আছে, পিওন আছে, রঙ-কর আছে, সম্পাদক আছে, গো-পালন বিশেষজ্ঞ আছে, সংস্কৃত পণ্ডিত আছে,—সর্বজাতির সর্বশ্রেণীর সমন্বয় ঘটেছে।

মহিলারা বললেন—আমারও যাব!

গান্ধিজী বললেন—না, তা হবেনা, মেয়েরা সামনে থাকলে গবর্মেণ্ট আমাদের উপর নির্মম হতে ইতস্ততঃ করবে। শত্রুর কঠোরতা আমি দুর্বল করে ফেলতে চাই না, সেইজন্যই প্রথম অগ্রগামী দলে আমি মেয়েদের রাখতে চাই না!

সোনালী রোদ সামনের ধূসর পথকে উজ্জ্বল করে তুললো, চল্লিশ কোটি জনগণের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মহাত্মাজী দাণ্ডির পথে মহা অভিযান সুরু করলেন, বললেন—লবণের শুল্ক যদি না তুলতে পারি, তাহলে আর আমি ফিরবো না, আমার দেহ সাগরের বুকে ভাসবে!

পিছনে চললেন উনআশিজন নির্ভীক সৈনিক। হাতে এক একগাছি লাঠি, কাঁধের থলিতে ঝুলছে নিত্য প্রয়োজনীয় দু-একটি জিনিস। তিনজন তিনজন করে এক এক সারি। পরনে শুভ্র খদ্দরের উপর প্রভাতী সূর্যের অরুণালোক রক্তিম আভায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে, বিদ্রোহের উপক্রমণিকাকে জানাচ্ছে আশীর্বাদ। দৃঢ় তাদের পদক্ষেপ, চোখে তাদের আত্মবিশ্বাসের দীপ্তি। সেই দীপ্তির প্রতিফলন উদ্ভাসিত হোল সমবেত অগণিত নরনারীর মনে, তারা সাড়া তুললো—গান্ধিজী কি জয়!

গান্ধিজী বললেন—সত্যাগ্রহীর পরাজয় নেই, জয়ী আমরা হবই, ভগবান আমার সহায়……

দীর্ঘ দুশো মাইল পথ। কখনো গাছের ছায়ায় শীতল, কখনো প্রান্তরের দীর্ঘশ্বাসে প্রখর। স্বাধীনতার তীর্থযাত্রীরা এগিয়ে চলেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। জেতালপুর…নবগাঁ…নড়িয়াদ…বোরসাদ…ব্রোচ্…ভাটগাঁ…সুরাট…জালালপুর…মহামানবের যাত্রাপথের রুক্ষতা, গ্রামবাসীরা জল ঢেলে স্নিগ্ধ করে। ঘরে ঘরে তেরঙা নিশান ওড়ায়, পুষ্পাকীর্ণ করে দেয় পথরেখা, পথের দু'পাশে এসে দাঁড়ায় নীরব শ্রদ্ধায় যুগাবতারের দীর্ঘজীবন কামনা করে পূত চিত্তে। হাত জোড় করে মহামানব এগিয়ে চলেন, স্মিত হাস্যে জনতাকে অভিনন্দিত করে বলেন—খদ্দর পর, নেশা ছাড়ো, স্বাধীনতার সংগ্রামে সত্যাগ্রহী হও, অহিংসাই আমাদের পথ।……

দিকে দিকে সাড়া জাগে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য অগ্রগামী হয়।

চব্বিশ দিন পরে গান্ধীজী দাণ্ডির সাগর সৈকতে এসে দাঁড়ালেন।

পরদিন প্রত্যূষে প্রার্থনা সভায় মহাত্মাজী বললেন—বৃটিশ শাসন ভারতের আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ধ্বংস এনে দিয়েছে। এই শাসন-ব্যবস্থাকে আমি অভিশাপ বলে মনে করি। এই শাসন-ব্যবস্থাকে ধ্বংস করতে আমি বাহির হয়েছি…আমরা কাউকে হত্যা করার জন্য পথে বাহির হইনি, কিন্তু এই অভিশাপকে নিশ্চিহ্নভাবে মুছে ফেলা আমাদের ধর্ম।……

শত সহস্র সশ্রদ্ধ নরনারীর সামনে মহাত্মাজী সাগর থেকে জল তুলে এনে

লবণ তৈরি করতে বসলেন, ঊনআশিজন আশ্রমিক তাঁর অনুগমন করলো। চারিপাশ থেকে সাড়া উঠলো—মহাত্মা গান্ধিকী জয় !

ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন।

এই লবণ-আইন-অমান্যের পিছনে একটা ইতিহাস আছে ঃ

শ'খানেক বছর আগে অবধি এদেশের মাল বিলাতে বিক্রী হোত। কিন্তু বিলিতী মালের কোন চাহিদা এদেশে ছিল না। এ দেশ থেকে জাহাজ ভর্তি করে জিনিস যেত বিলাতে আর সেই জাহাজ ফিরে আসতো খালি। শূন্য জাহাজ সমুদ্রে চলে না, তাই জাহাজের ভার ঠিক রাখার জন্য বিলাত থেকে জাহাজে মাটি বোঝাই করে আনা হোত। গঙ্গা থেকে কালীঘাটের মন্দির অবধি একটি খাল ছিল, জাহাজে আনা সেই মাটি ফেলে ফেলে খালটি বুজিয়ে দেওয়া হোল। তারই নাম হয়েছে এখন চৌরঙ্গী রোড। কিন্তু মাটি আনা তো আর লাভের ব্যবসা নয়, এমন কিছু আনতে হবে যা এদেশে বিক্রী করে দু'পয়সা পাওয়া যায়। সাহেবরা ঠিক করলো মাটির বদলে লবণ আনা হবে। কিন্তু দেশী লবণ সস্তায় বিক্রী হয়, বিলিতী লবণ লোকে কিনবে কেন ? ইংরাজরা তখন এদেশের রাজা হয়ে বসেছে, আইন কানুন সবই তো তখন নিজেদের হাতে। তখন তারা আইন করে দেশী লবণের উপর কর বসিয়ে দিল। কর দিতে গিয়ে দেশী লবণের দাম বেড়ে গেল, বিলিতী লবণ সস্তায় বাজারে বিক্রী হতে লাগলো। এ থেকে সরকারের দু'দফা আয় হতে লাগলো, এক দফা লবণ বেচে, আরেক দফা কর আদায় করে। বছরে এ থেকে নেহাৎ কম টাকা হয় না, শুধু ১৯২৫ সালের হিসাব থেকেই দেখা যায় ইংরাজ সরকার এদেশে বিলিতী লবণ বিক্রী করে এক কোটি বাহাত্তর লক্ষ মণ, আর দেশী লবণের উপর কর আদায় করে দশ কোটি টাকা।

লবণ মানুষের নিত্যকার প্রয়োজনীয় খাদ্য, তার উপর এইভাবে কর বসানো অন্যায়। এদেশের মানুষ বড় গরীব, লবণ কিনে খাবে অনেকেরই এমন অবস্থা নয়। সমুদ্রের তীরে যারা থাকে তাদেরকেও লবণ কিনে খেতে হয়। সমুদ্রতটে লবণের দানা পড়ে থাকলেও কুড়িয়ে নেবার অনুমতি নেই। পাছে কেউ সেভাবে লবণ সংগ্রহ করে, তাই সাগরতটে পাহারা মোতায়েন আছে। লবণ সংগ্রহ করলেই গ্রেপ্তার হতে হবে। আইনের নামে গরীবদের উপর অত্যাচার ছাড়া এ আর কিছু নয়। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই গান্ধিজী আঘাত করলেন—লবণ সত্যাগ্রহ।

গান্ধিজী ঘোষণা করলেন—দেশের জন্য রাজদণ্ড ভোগ করতে যারা প্রস্তুত, তারা নিজ নিজ সুবিধা অনুযায়ী আইন অমান্য করে লবণ তৈরী করতে পারে।

গান্ধিজীর নির্দেশ, নব ভারতের বেদমন্ত্র। চল্লিশ কোটি নরনারী নতুন অনুভূতিতে চঞ্চল হয়ে উঠলো।

অনুশীলনী

১। গান্ধিজীর দাণ্ডি- অভিযান কাহিনী বিবৃত কর। এই অভিযানের উদ্দেশ্য কি ছিল?

২। দেশে কিভাবে 'আইন অমান্য' আন্দোলন সুরু হইল বল। এইরূপ নাম হওয়ার কারণ কি?

৩। 'এই লবণ আইন অমান্যের পিছনে একটা ইতিহাস আছে।'—এই ইতিহাস কি?

৪। প্রবন্ধটি হইতে গান্ধী-চরিত্রের পরিচয় দাও।

৫। টীকা লিখ: সবরমতী আশ্রম, বৃটিশ শাসন, বড়লাট, কালীঘাট, বেদমন্ত্র।

৬। অর্থ লিখ: মৃত্যুভয়াল, পুঞ্জীভূত, বিপন্ন, অরুণালোক, সৈকত, শুল্ক।

৭। বাক্যে ব্যবহার কর: তেরঙা, দাসজাতি, অন্নবস্ত্র, প্রভাতী, আশ্রমিক।

৮। পদান্তর কর: সোনালী, বিলিতী, আরব্ধ, অভিনন্দিত, অভিশাপ, ধূসর, উজ্জ্বল, রক্তিম।

৯। সমাস ও ব্যাসবাক্য লিখ: অন্নবস্ত্র, মৃত্যুঞ্জয়ী, সত্যসেবী, অগ্রগামী, যুগাবতার, মহামানব, গ্রামান্তর, রাজদণ্ড।

১০। লিঙ্গান্তর কর: সন্ন্যাসী, ভগবান, তাঁতী, পণ্ডিত।

১১। শূন্যস্থান পূরণ কর:

(ক) ভারতের — বৃটিশ শাসন একটি —। এই শাসন ব্যবস্থা আমাদের — পরিণত করেছে। আমাদের — মূলে — করেছে, আমাদের ধর্মনীতিকে — করেছে।

(খ) একষট্টি বছরের — সবরমতীর — এসে দাঁড়ালেন। পরণে — হাতে একগাছি — সঙ্গে উনআশীজন — আশ্রমিক।

———



[বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের একজন মহৎ কথাশিল্পী। 'পথের পাঁচালী' তাঁহার অমর লেখনীর অনবদ্য সৃষ্টি। 'বনভোজন' কাহিনীটি এই উপন্যাসের অন্তর্গত। একদিকে প্রকৃতির অনাবিল সৌন্দর্য অন্যদিকে শিশু মনের অকপট সরলতা ও আনন্দ বর্ণনার কাহিনীটি অপূর্বতা লাভ করিয়াছে।]

চারিদিক বনে ঘেরা, বাহির হইতে দেখা যায় না। খোলা ঘরের মাটির ছোবার মত ছোট্ট একটা হাঁড়িতে দুর্গা ভাত চড়াইয়া দিয়া বলিল—এই দ্যাখ্ অপু, কত বড় বড় মেটে আলুর ফল নিয়ে এসেচি এক জায়গা থেকে, পুঁটিদের তালতলায় একটা ঝোপের মাথায় অনেক হয়ে আছে, ভাতে দেবো···

অপু মহা উৎসাহে শুক্‌না লতা-কাণ্ড কুড়াইয়া আনে, এই তাহাদের প্রথম বন-ভোজন। অপুর এখনও বিশ্বাস হইতেছিল না যে, এখানে সত্যিকারের ভাত-তরকারী রান্না হইবে, না খেলাঘরের বনভোজন, যা কতবার হইয়াছে, সেরকম হইবে—ধুলার ভাত, খাপরার আলুভাজা, কাঁটাল পাতার লুচি?

কিন্তু বড় সুন্দর বেলাটি। বড় সুন্দর স্থান বন-ভোজনের। চারি ধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা লতার দুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে সেওড়া গাছে ফুলের ঝাড়, আধপোড়া কটা দূর্বাঘাসের উপর খঞ্জনী পাখিরা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, নির্জন ঝোপে—ঝোপের আড়ালে নিভৃত নিরালা স্থানটি। প্রথম বসন্তের দিনে ঝোপে-ঝোপে নতুন কচি পাতা, ঘেঁটু ফুলের ঝাড় পোড়ো ভিটাটা আলো করিয়া ফুটিয়া আছে, বাতাবিলেবু গাছটায় থোপা থোপা সাদা সাদা ফুল উপরের ডালে চোখে পড়ে।

দুর্গা আজকাল যেন এই গাছপালা পথঘাট অতি পরিচিত গ্রামের প্রতি অন্ধি-সন্ধিকে অত্যন্ত বেশী করিয়া আঁকড়াইয়া ধরিতেছে। আসন্ন বিরহের কোন্ বিষাদে এই কত প্রিয় গাবতলার পথটি, ওই তাহাদের বাড়ীর পিছনের বাঁশবন, ছায়া-ভরা নদীর ঘাটটি আচ্ছন্ন থাকে, তাহার অপু—তাহার সোনার খোকা ভাইটি, যাহাকে এক বেলা না দেখিয়া সে থাকিতে পারে না, মন হুহু করে—তাহাকে ফেলিয়া সে কতদূর যাইবে!

চড়ুই ভাতির মাঝামাঝি অপুদের বাড়ীর উঠানে কাহার ডাক শোনা গেল। দুর্গা বলিল—বিনির গলা যেন—নিয়ে আয় তো ডেকে অপু। একটু পরে অপুর পিছনে পিছনে দুর্গার সমবয়সী একটি কালো মেয়ে আসিল—একটু হাসিয়া যেন কতটা সম্ভ্রমের সুরে বলিল—কি হচ্ছে দুর্গা দিদি?

দুর্গা বলিল—আয়না বিনি, চড়ুই ভাতি কচ্চি—বোস্। মেয়েটি ওপাড়ার কালীনাথ চক্রবর্ত্তির মেয়ে—পরনে আধময়লা শাড়ী, হাতে সরু সরু কাঁচের চুড়ি, একটু লম্বা গড়ন, মুখ নিতান্ত সাদাসিধা, তাহার বাপ যুগীর বামুন বলিয়া সামাজিক ব্যাপারে পাড়ায় তাদের নিমন্ত্রণ হয় না, গ্রামের একপাশে নিতান্ত সংকুচিতভাবে বাস করে, অবস্থাও ভাল নয়, বিনি দুর্গার ফরমাইস খাটিতে লাগিল খুব। বেড়াইতে আসিয়া হঠাৎ সে যেন একটা লাভজনক ব্যাপারের মত আসিয়া পড়িয়াছে, এখন ইহারা তাহাকে সে উৎসবের অংশীদার স্বীকার করিবে, কি-না করিবে একটা দ্বিধামিশ্রিত উল্লাসের ভাব তাহার কথাবার্তার ভাবভঙ্গিতে প্রকাশ পাইতেছিল, দুর্গা বলিল—বিনি, আর দুটো শুক্নো কাঠ দ্যাখতো—আগুনটা জ্বলছে না ভাল—

বিনি তখন কাঠ আনিতে ছুটিল এবং একটু পরে এক বোঝা শুকনা বেলের ডাল আনিয়া হাজির করিয়া বলিল—এতে হবে দুগ্গা দিদি—না আর আন্বো? দুর্গা তখন বলিল—বিনি এসেছে—ও-ওতো এখানে খাবে—আর দুটো চাল নিয়ে আয় অপু—বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। খানিকটা পরে বিনি জল আনিয়া দিল। আগ্রহের সুরে জিজ্ঞাসা করিল—কি কি তরকারী দুগ্গা দিদি?

ভাত নামাইয়া দুর্গা ছোবাতে তেলটুকু দিয়া বেগুন তাহাতে ফলিয়া দিয়া ভাজে। খানিকটা পরে সে অবাক হইয়া ছোবার দিকে চাহিয়া থাকে, অপুকে

ডাকিয়া বলে—ঠিক একেবারে সত্যিকারের বেগুন ভাজার মত রং হচ্ছে দেখছিস্ অপু! ঠিক যেন মা'র রান্না বেগুর ভাজা, না? অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্যবোধ হয়। তাহারও এতক্ষণ যেন বিশ্বাস হইতেছিল না যে তাহাদের বন-ভোজনে সত্যিকার ভাত, সত্যিকার বেগুন ভাজা, সম্ভবপর হইবে। তাহার পর দু'জনে মহা আনন্দে কলার পাতে খাইতে বসে, শুধু ভাত আর বেগুন ভাজা, আর কিছু না। অপু গ্রাস মুখে তুলিবার সময় দুর্গা সেদিকে চাহিয়াছিল, আগ্রহের সংগে জিজ্ঞাসা করে,—কেমন হয়েছে রে বেগুন ভাজা?

অপু বলে—বেশ হয়েছে দিদি, কিন্তু নুন হয়নি যেন—লবণকে রন্ধনের উপকরণের তালিকা হইতে ইহারা অদ্য একেবারে বাদ দিয়াছে, লবণের বালাই রাখে নাই। কিন্তু মহাখুশিতে তিনজনে কোষা মেটে-আলুর ফলেও পানসে আধ-পোড়া বেগুন ভাজা দিয়া চড়ুইভাতির ভাত খাইতে বসিল, দুর্গার এই প্রথম রান্না, সে বিস্ময় মিশানো আনন্দের সঙ্গে নিজের হাতের শিল্প-সৃষ্টি উপভোগ করিতেছিল। এই বন-ঝোপের মধ্যে, এই শুকনা আতাপাতার রাশের মধ্যে, খেজুরতলার ঝরিয়া-পড়া খেজুর পাতার পাশে বসিয়া সত্যিকারের ভাত-তরকারী খাওয়া!

খাইতে খাইতে দুর্গা অপুর দিকে চাহিয়া হিহি করিয়া খুশির হাসি হাসিল। খুশিতে ভাতের দলা তাহার গলার মধ্যে আট্‌কাইয়া যাইতে ছিল যেন। বিনি খাইতে খাইতে ভয়ে ভয়ে বলিল—একটু তেল আছে দুগ্‌গাদি? মেটে আলুর ফল ভাতে মেখে নিতাম।

দুর্গা বলিল—অপু ছুটে নিয়ে আয় একটু তেল—।

যে জীবন কতশত পুলকের ভাণ্ডার, কত আনন্দ মুহূর্তের আলো-জ্যোৎস্নার অবদানে মণ্ডিত, ইহাদের সেই মাধুরীময় জীবনযাত্রার সবে তো আরম্ভ। অনন্ত যে জীবনপথ দূর হইতে বহুদূরে দৃষ্টির কোন ওপারে বিসর্পিত, সে পথের ইহারা নিতান্ত ক্ষুদ্র পথিকদল, পথের বাঁকে ফুলে ফলে দুঃখসুখে, ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নতুন।

আনন্দ! আনন্দ! প্রসারের আনন্দ, জীবনের মাঝে মাঝে যে আড়াল আছে, বিশাল তুষারমৌলি গিরিসংকটের ওদিকের যে পথটা দেখিতেছে না, তাহার আনন্দ। আজকের আনন্দ! সামান্য সামান্য ছোটোখাটো তুচ্ছ জিনিসের আনন্দ।

অনুশীলনী

১। অপু ও দুর্গার বনভোজনের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
২। বনভোজন স্থানটির বর্ণনা দাও।
৩। 'বনভোজন' কাহিনী হইতে শিশুমনের পরিচয় দাও।
৪। 'বিনির মুখখানা খুশিতে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।'
বিনি কে? তাহার খুশির কারণ কি?
৫। 'অপুরও ব্যাপারটা আশ্চর্য বোধ হয়।'
ব্যাপারটি কি? অপুর বিস্ময়ের কারণ কি?
৬। অর্থ লিখ ঃ—খাপরা, দুলুনি, খোপা, অন্ধি-সন্ধি, বালাই, বিসর্পিত তুষার-মৌলি, ভাণ্ডার।
৭। ব্যাখ্যা কর ঃ—(ক) অনন্ত যে জীবনপথ দূর হইতে......ইহাদের অভ্যর্থনা একেবারে নতুন।
(খ) আনন্দ! আনন্দ! প্রসারের আনন্দ,......তাহার আনন্দ।
(গ) সে বিস্ময় মিশানো আনন্দের সঙ্গে......উপভোগ করিতেছিল।
৮। বাক্য রচনা কর ঃ—উপকরণ, পানসে, ভাণ্ডার, অভ্যর্থনা, ফুলেফলে ফরমাইস, অংশীদার।
৯। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ—
(ক) **দু'জনে** মহাআনন্দে **কলারপাতে** খাইতে বসে।
(খ) মেটে আলুর **ফল ভাতে** মেখে নিতাম।
(গ) বিনির **মুখখানা খুশিতে** উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।
১০। পদান্তর কর ঃ—প্রসার, বিশাল, তুচ্ছ, উজ্জ্বল, উল্লাস, সামাজিক, আচ্ছন্ন।
১১। সমাস নির্ণয় কর ঃ—বিস্ময়মিশানো, বেগুনভাজা, আধ-পোড়া, তুষার মৌলি, ফলেফুলে, ছায়া-ভরা, খেলাঘর, বনভোজন,।
১২। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ—
তাহারও এতক্ষণ যেন — হইতেছিল না যে তাহাদের বন-ভোজনে — ভাত, সত্যিকার বেগুন ভাজা — হইবে। —পর দু'জনে মহা— কলার — খাইতে বসে, শুধু ভাত — বেগুন ভাজ, আর — না। অপু — মুখ — সময় দুর্গা — চাহিয়াছিল।

———



[অবনীন্দ্রনাথ একাধারে চিত্রশিল্পী ও কথাশিল্পী, তাঁহার সাহিত্য প্রধানতঃ চিত্রপ্রধান। কথার পর কথা বসাইয়া চিত্র আঁকিয়াছেন প্রতিটি রচনায়। ভাষার মাধুর্য এবং মনোহর বাগ্‌ভঙ্গি তাঁহার সাহিত্যের বিশিষ্ট দিক, 'রাজপুত কাহিনী' তাঁহার একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। ইহা রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্যের অমর আলেখ্য, 'মীরাবাঈ' গল্পটি ঐ গ্রন্থের অন্তর্গত। 'নন্দলালা'-র প্রেমের আকর্ষণে রাজরাণী মীরা কেমন করিয়া বিলাস-বৈভব, সংসার-পরিজন ছাড়িয়া পথে বাহির হইলেন—এই গল্পে তাহাই সুন্দরভাবে ব্যক্ত হইয়াছে।]

রাণা কুম্ভ চিতোরের সিংহাসনে বসেছেন। তাঁর রাণী মীরা দেখতে যেমন, গান গাইতেও তেমন। রাতিয়া-রাণার মেয়ে মীরা! তাঁর গান শুনে, রূপ দেখে রাণা কুম্ভ তাঁকে বিয়ে করেন। রাণী স্বামীর সেবা করেন, কিন্তু মন তাঁর পড়ে থাকে—রণ্‌ছোড়জীর মন্দিরে বাঁশি হাতে কালো পাথরের দেবমূর্তির পায়ের কাছে।

রাণার কিন্তু এ ভালো লাগে না। তিনি নিজে কবি, গান রচনা করেন, আর সেই গান মীরা গায় রাজমন্দিরে বসে—এই চান রাণা। কিন্তু সে তো হল না! মীরা দেবতার দাসী, তিনি রণ্‌ছোড়জীর মন্দিরেই সারা দিনমান ভক্তদের মধ্যে গাইতে লাগলেন, "মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা!"

চিতোরেশ্বরী মীরা সবার মাঝে গান গাইবে একতারা বাজিয়ে, এটা ভারি লজ্জার কথা হয়ে উঠল। রাণা হুকুম দিলেন, "মন্দিরে বাইরের লোক আসা বন্ধ কর।" এক রাতের মধ্যে মন্দিরটা কানাতে ঘেরা হয়ে গেল। মীরাকে আর

কেউ দেখতে পায় না কিন্তু তাঁর গানের সুর শুনতে কানাতের বাইরে দেশ বিদেশের লোক জড়ো হয়। বাঁশি-হরিণ যেমন, তেমনি সবাই এক-মনে কান পেতে প্রাণভরে মীরার গান শুনতে থাকে—তাড়ালে যায় না, হুকুম শোনে না, কাউকে মানেও না।

জোছনা-রাতে মন্দিরের সামনে শ্বেত-পাথরের বেদীতে বসে সোনা আর হীরে জড়ানো সাজে সেজে মীরা স্বর্গের অপ্সরীর মতো দেবতার সামনে একলা নাচছেন, গাইছেন, রাণা বীণা বাজাচ্ছেন, বাইরে লোকের ভিড়, এমন সময় আকাশ থেকে তারার মালার মতো এক গাছি হীরের হার মীরার গলায় এসে পড়ল। রাণা চমকে উঠে বীণা বন্ধ করলেন। হার যে কে দিয়ে গেল, তার আর খোঁজ হল না, কিন্তু দেশে নানা কথা রটল। কেউ বললে, দিল্লীর বাদশা দিয়ে গেছেন; কেউ বললে কে-এক উদাসীন, কেউ বা আরো কত কি! কিন্তু মীরা অমূল্য হার রাণাকে না দিয়ে যে রণছোড়জীকে নিবেদন করে দিয়েছেন তাতে সবাই খুশি হল। ভক্তেরা মীরার জয়জয়কার দিলে! কিন্তু কুম্ভ রাণা একটু চটলেন। তিনি হুকুম দিলেন, "এবারে ভক্তেরা আসুন মন্দিরে আর মীরা থাকুন বন্ধ অন্দরে।" এই হুকুম দিয়ে রাণা মহম্মদ খিলজীর সঙ্গে লড়ায়ে চলে গেলেন। মীরার গান বন্ধ হল। সেই সঙ্গে চিতোর নিরানন্দ হয়ে গেল। মন্দিরে কাঁদে ভক্তেরা; অন্দরে কাঁদেন মীরা। নন্দলালার দেখা না পেয়ে বন থেকে ছিঁড়ে আনা ফুলের মতো মীরা দিন-দিন মলিন হচ্ছেন, এমন সময় এক দিন যুদ্ধ জয় করে ধুমধামে মহারাণা চিতোরে এলেন। মামুদ-শাকে তার মুকুটের সঙ্গে রাণা চিতোরে বন্ধ রাখলেন। রাজ্যের কারিগর মিলে পাথর কেটে চিতোরের মাঝখানে প্রকাণ্ড জয়স্তম্ভ তুলতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু মীরার মন রাণা জয় করতে পারলেন না; মীরা বললেন, "রাণা, আমি নন্দলালার দাসী, আমাকে ঘরে বন্ধ করো না। আমি শুনতে পাচ্ছি আমার নন্দলালা বাইরে থেকে আমাকে ডাকছেন—'মীরা আয়!' আমাকে ছেড়ে দাও রাণা, আমি পথের কাঙালিনী হয়ে নন্দলালার সঙ্গে বৃন্দাবনে চলে যাই।' রাণা রেগে বললেন, "রতিয়া সামান্য সর্দার, তার মেয়ে তুমি! তোমার কপালে সিংহাসন জুটবে কেন? যাও বেরিয়ে—যেখানে খুশি—আমি নতুন রাণী নিয়ে আসছি।" সেইদিন চিতোরেশ্বরী মীরা, নন্দলালার মীরা, ভিখারিণীর মতো একতারা বাজিয়ে পথে বার হলেন। আর রাণা বার হলেন নতুন রাণীর খোঁজে।

অনুশীলনী

১। মীরাবাঈ কে? তাঁহার ভগবদ্‌প্রেমের পরিচয় দাও।

২। 'রতিয়া সামান্য সর্দার, তার মেয়ে তুমি! তোমার কপালে সিংহাসন জুটবে কেন?'

—কে কাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন? এইরূপ বলিবার কারণ কি?

৩। 'কিন্তু মীরা অমূল্য হার রাণাকে না দিয়ে যে রণ্‌ছোড়জীকে নিবেদন করে দিয়েছেন তাতে সবাই খুশি হল।'

—এখানে কোন্‌ হারের কথা বলা হইয়াছে? মীরা হারটি রাণাকে না দিয়া রণ্‌ছোড়জীকে দিলেন কেন? মীরার আচরণে সকলের খুশি হওয়ার কারণ কি?

৪। ব্যাখ্যা কর: (ক) মন্দিরে কাঁদে ভক্তেরা, অন্দরে কাঁদেন মীরা,
(খ) মীরা কহে বিনা প্রেমসে না মিলে নন্দলালা।

৫। অর্থ লিখ: কানাত, অপ্সরী জয়স্তম্ভ, উদাসীন, একতারা।

৬। টীকা লিখ: রাণা কুম্ভ, নন্দলালা, মহম্মদখিলজী, মামুদ-শা।

৭। ব্যাস বাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর:

৮। ব্যাস বাক্যসহ সমান নির্ণয় কর:

সিংহাসন, চিতোরেশ্বরী, একতারা, রাজমন্দির, জোছ্‌না-রাতে, বংশীধারী।

৯। লিঙ্গান্তর কর: ভিখারিণী, অপ্সরী, বাদশা, দাসী, ভক্ত।

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর:

বাঁশি শুনে হরিণ —, তেমনি সবাই কান-পেতে — মীরার গান শুনতে থাকে, মীরার — বন্ধ হল, সেই সংগে চিতোর — হয়ে গেল। মন্দিরে— ভক্তেরা, — কাঁদেন মীরা। — দেখা না পেয়ে বন থেকে ছিঁড়ে আনা — মতো মীরা দিনদিন—হচ্ছেন।

———



[শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একজন জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক। বঞ্চিত, লাঞ্ছিত, নিঃস্ব মানুষের অকুণ্ঠ আত্মপ্রকাশে তাঁহার সাহিত্য মুখর। মানব প্রীতি তাঁহার সাহিত্যের মূলকথা। চিত্তাকর্ষক বর্ণনা-ভঙ্গি, সহজ সরল, সাবলীল ভাষা তাঁহার রচনার জনপ্রিয়তার অন্যতম কারণ। 'রাজবিদ্রোহী' কাহিনীটি তাঁহার বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের দাবী'-র অন্তর্গত। রাজদ্রোহীর চলার পথ যে কত কণ্টকাকীর্ণ এবং তাহার জীবন যে কত বিপদাপন্ন এখানে তাহাই দেখান হইয়াছে।]

পিছন হইতে ডাক শুনিল, এ কি অপূর্ব্ব নাকি? এখানে!

অপূর্ব্ব ফিরিয়া দেখিল, সাধারণ ভদ্র বাঙালীর পোষাকে দাঁড়াইয়া তাহাদের পরিচিত নিমাইবাবু। ইনি বাংলা দেশের একজন বড় পুলিশ কর্ম্মচারী।... অপূর্ব্ব তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিজের চাকরীর সংবাদ দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু আপনি যে এদেশে?

নিমাইবাবু আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, বাবা, কচি ছেলে তুমি, তোমাকে এতটা দূরে ঘর দোর মা-বোন ছেড়ে আসতে হয়েছে আর আমাকে হ'তে পারে না? পকেট হইতে ঘড়ি বাহির করিয়া দেখিয়া কহিলেন, আমার সময় নেই, কিন্তু তোমার ত অফিসে যাবার এখনও ঢের দেরি আছে। চলনা বাবা, পথে যেতে যেতে দুটো কথা শুনি। কতকাল যে তোমাদের খবর নিতে পারিনি তার ঠিক নেই। মা ভাল আছেন? দাদারা?

সকলেই ভাল আছেন জানাইয়া অপূর্ব্ব প্রশ্ন করিল, আপনি এখন কোথায় যাবেন?

জাহাজ ঘাটে। চল না আমার সঙ্গে।

চলুন। আপনাকে কি আর কোথাও যেতে হবে?

নিমাইবাবু হাসিয়া কহিলেন, হতেও পারে।

যে মহাপুরুষকে সম্বধনা করে নিয়ে যাবার জন্যে দেশ ছেড়ে এত দূরে আসতে হয়েছে; তাঁর মস্তিজর উপরেই এখন সমস্ত নির্ভর করছে। তাঁর ফটোগ্রাফও আছে, বিবরণও দেওয়া আছে, কিন্তু এখানের পুলিশের বাবার সাধ্য নেই যে তাঁর গায়ে হাত দেয়। আমিই পারব কিনা তাই ভাবছি।

অপূর্ব্ব জিজ্ঞাসা করিল, পোলিটিক্যাল আসামী বুঝি?

নিমাইবাবু ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, ওরে বাবা, পোলিটিক্যাল আসামী ত লোকে তোদেরও এক সময় বলত। কিন্তু সে বললে এঁর কিছুই বুঝা যায় না। ইনি হচ্ছেন রাজবিদ্রোহী! রাজার শত্রু! হাঁ শত্রু বলবার লোক বটে। বলিহারি তাঁর প্রতিভাকে যিনি এই ছেলেটির নাম রেখেছিলেন সব্যসাচী। মহাভারতের মতে নাকি তাঁর দুটো হাতই সমানে চলত, কিন্তু প্রবল প্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের সুগুপ্ত ইতিহাসের মতে এই মানুষটির দশ ইন্দ্রিয়ই নাকি বাবা সমান বেগে চলে। বন্দুক পিস্তলে এঁর অভ্রান্ত লক্ষ্য, পদ্মানদী সাঁতার কেটে পার হয়ে যান, বাধে না,—সম্প্রতি অনুমান এই যে চট্টগ্রামের পথে পাহাড় ডিঙিয়ে তিনি বার্মা মুলুকে পদার্পণ করেছেন। এখন ম্যাণ্ডালে থেকে নদী পথে জাহাজে চড়ে রেঙ্গুনে আসবেন।

অপূর্ব্ব উৎসাহ ও উত্তেজনায় চঞ্চল হইয়া কহিল, এতদিন কোথায় এবং কি করছিলেন ইনি। সব্যসাচী নাম ত কখন শুনেছি মনে হচ্ছে না। নিমাইবাবু সহাসে কহিলেন, ওরে বাবা, এই সব বড় লোকদের কি আর কেবল একটা নামে কাজ চলে? অর্জ্জুনের মত দেশে দেশে কত নামই এঁর প্রচলিত আছে। সেকালে হয়ত শুনেও থাকবে এখন চিনতে পারছো না। আর কি যে ইতিমধ্যে করছিলেন সম্যক্ ওয়াকিবহাল নই। রাজ-শত্রুরা ত তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম্ম ঢাকপিটে করতে পছন্দ করেন না, তবে পুনরায় দেশে এক দফা তিন মাস এবং সিঙ্গাপুরে এক দফা তিন বছর জেল খেটেছেন জানি। ছেলেটি দশ বারোটা ভাষা এমন বলতে পারে যে বিদেশী লোকের পক্ষে চেনা ভার ইনি কোথাকার। জারমেনির জেনা না কোথায় ডাক্তারী পাশ করেছে, ফ্রান্সে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেছে, বিলেতে আইন

পাশ করেছে, আমেরিকায় কি পাশ করেছে জানিনে, তবে সেখানে ছিল যখন, তখন কিছু একটা করেই থাকবে,—এসব বোধ করি এঁর তাসপাশা খেলার সামিল,—রিক্রিয়েশান, কিন্তু কিছুই কোন কাজে এলো না বাবা, এর সর্ব্বাঙ্গের শির দিয়ে ভগবান এমনি আগুন জ্বেলে দিয়েছেন যে ওকে জেলেই দাও আর শূলেই দাও,—ঐ যে বললুম পঞ্চভূত ছাড়া আর আমাদের শান্তি স্বস্তি নেই। এদের না আছে দয়া-মায়া, না আছে ধর্ম কর্ম, না আছে কোন ঘর দোর,—বাপ্‌রে বাপ্! আমরাও ত এ দেশেরই মানুষ, কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাঙ্‌লা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না!

অপূর্ব্ব সহসা কথা কহিতে পারিল না,—শিরার মধ্যে দিয়া তাহারও যেন আগুন ছুটিতে লাগিল। কিছুক্ষণ নিঃশব্দে চলার পরে আস্তে আস্তে কহিল, এঁকে কি আজ আপনি অ্যারেস্ট করবেন?

নিমাইবাবু হাসিয়া বলিলেন, আগে ত পাই!

...উভয়ে জেটিতে যখন প্রবেশ করিলেন তখন সেই মাত্র ইরাবতী নদীর প্রকাণ্ড ষ্টীমার তীরে ভিড়িবার চেষ্টা করিতেছিল। পাঁচ সাত—জন পুলিশ কর্মচারী সাদা পোষাকে পূর্ব্বে হইতেই দাঁড়াইয়াছিল, নিমাইবাবুর প্রতি তাহাদের এক প্রাকার চোখের ইঙ্গিতে লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব্ব তাহাদের স্বরূপ চিনিতে পারিল। ইহারা সকলেই ভারতবর্ষীয়,—ভারতের কল্যাণের নিমিত্ত সুদূর বর্মায় বিদ্রোহী শিকারে বাহির হইয়াছেন। সেই শিকারের বস্তু তাঁহাদের করতলগতপ্রায়। সফলতার আনন্দ ও উত্তেজনার প্রচ্ছন্ন দীপ্তি তাঁহাদের মুখে চোখে প্রকাশ পাইয়াছে অপূর্ব্ব স্পষ্ট দেখিতে পাইল। লজ্জায় ও দুঃখে সে মুখ ফিরাইতেই অকস্মাৎ এক মুহূর্ত্তে তাহার সমস্ত ব্যথিত চিত্ত গিয়া যেন কোন্ এ অদৃষ্টপূর্ব্ব অপরিচিত দুর্ভাগার পদপ্রান্তে উপুড় হইয়া তাহার পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল। জাহাজের খালাসীরা তখন জেটির উপরে দড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিতেছিল, কত লোক রেলিঙ্ ধরিয়া তাহাই উদ্‌গ্রীব হইয়া দেখিতেছে,—ডেকের উপর ব্যগ্রতা, কলরব ছুটোছুটির অবধি নাই,—হয়ত, ইহাদেরই মাঝখানে দাঁড়াইয়া একজন এমনি উৎসুক চক্ষে তীরের প্রতীক্ষা করিতেছে, কিন্তু অপূর্ব্বর চোখে সমস্ত দৃশ্যই চোখের জলে একেবারে ঝাপসা একাকার হইয়া গেল। উপরে, নীচে, জলে স্থলে এত নরনারী দাঁড়াইয়া, কাহারও কোন শঙ্কা নাই, কোন অপরাধ নাই, শুধু যে

লোক তাহার তরুণ হৃদয়ের সকল স্বার্থ, সকল আশা স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়াছে, কারাগার ও মৃত্যুর পথ কি কেবল তাহারই জন্য হাঁ করিয়া রহিয়াছে। জাহাজ জেটির গায়ে আসিয়া ভিড়িল কাঠের সিঁড়ি নীচে আসিয়া লাগিল, নিমাইবাবু তাঁহার দলবল লইয়া পথের দু-ধারে সারি দিয়া দাঁড়াইলেন, কিন্তু অপূর্ব্ব নড়িল না। সে সেখানে নিশ্চল পাথরের মূর্ত্তির মত দাঁড়াইয়া একান্ত মনে বলিতে লাগিল, মুহূর্ত্ত পরে তোমার হাতে শৃঙ্খল পড়িবে, কৌতূহলী নর-নারী তোমার লাঞ্ছনা ও অপমান চোখ মেলিয়া দেখিবে, তাহারা জানিতেও পারিবে না যাহাদের জন্য তুমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছ বলিয়াই তাহাদের মধ্যে আর তোমার থাকা চলিবে না। তাহার চোখ দিয়া ঝর ঝড় করিয়া জল পড়িতে লাগিল এবং যাহাকে সে কোনদিন দেখে নাই, তাহাকেই সম্বোধন করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, তুমিতো আমাদের মত সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্য সমস্ত দিয়াছ, তাইতো দেশের খেয়া-তরী তোমাকে বহিতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পদ্মা পার হইতে হয়, তাইতো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড় পর্ব্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়,—কোন বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্যইতো প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল—সেই তো তোমার গৌরব! তোমাকে অবহেলা করিবে সাধ্য কার! এই যে অগণিত প্রহরী, এই যে বিপুল সৈন্যভার, সে তো কেবল তোমারই জন্য। দুঃখের দুঃসহ গুরুভার বহিতে তুমি পার বলিয়াই তো ভগবান এত বড় বোঝা তোমারই স্কন্ধে অর্পণ করিয়াছেন। মুক্তি পথের অগ্রদূত! পরাধীন দেশের হে রাজবিদ্রোহী! তোমাকে শত কোটি নমস্কার! এত লোকের ভিড়, এত লোকের আনাগোনা, এত লোকের দৃষ্টি কিছুতেই তাহার খেয়াল ছিল না,—নিজের মনের উচ্ছ্বসিত আবেগে অবিচ্ছিন্ন অশ্রুধারে তাহার গণ্ড, তাহার চিবুক, তাহার কণ্ঠ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। সময় যে কত কাটিল সে দিকেও তাহার কিছুমাত্র দৃষ্টি ছিল না, হঠাৎ নিমাইবাবুর কণ্ঠস্বরে সে চকিত হইয়া তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি হাসিবার চেষ্টা করিল। তাহার তদ্গত বিহ্বল ভাব তিনি লক্ষ্য করিয়া আশ্চর্য্য হইলেন, কিন্তু কোন প্রশ্ন করিলেন না, বলিলেন, যা ভয় করেছিলাম তাই! পালিয়েছে।

অনুশীলনী

১। রাজবিদ্রোহীর পরিচয় উদ্‌ঘাটিত কর।

২। 'তোমাকে শতকোটি নমস্কার।'—কে, কাহার উদ্দেশ্যে এই কথা বলিয়াছিলেন? বক্তার নমস্কার জানাইবার হেতু কি?

৩। 'সেই শিকারের বস্তু তাঁহাদের করতলগত প্রায়।'—শিকারের বস্তু কে? তাঁহাদের বলিতে কাহাদের কথা বলা হইয়াছে? তাঁহারা শিকারকে করতলগত করিতে কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন? তাঁহাদের প্রচেষ্টা কি সফল হইয়াছিল?

৪। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ।

(ক) তুমি তো আমাদের মত...পদ্মা পার হইতে হয়।

(খ) আমরাও ত এদেশেরই মানুষ কিন্তু এ ছেলে যে কোত্থেকে এসে বাংলা মুলুকে জন্মালো তা ভেবেই পাওয়া যায় না।

৫। অর্থ লিখ ঃ—

মুরুব্বি, মহাপুরুষ, মাঁজ, ফটোগ্রাফ, বলিহারী, সব্যসাচী, রাজবিদ্রোহী।

৬। টীকা লিখ।

সব্যসাচী, মহাভারত, ফ্রান্স, আমেরিকা, পদ্মানদী, বর্ম, ম্যান্ডল।

৭। পদ পরিবর্তন কর।

প্রসাদ, প্রণাম, উত্তেজনা, সরলতা, ভারত, হৃদয়, উচ্ছ্বসিত।

৮। বাক্যে ব্যবহার কর।

খেয়াল, ঝরঝর, গুরুভার, চকিত, সফলতা, নশ্বর, জিম্মায়।

৯। শূন্যস্থান পূরণ কর।

দেশের—তোমার কাছে রুদ্ধ,—পাহাড় পর্বত তোমাকে—চলিতে হয়; কোন্ বিস্মৃত — তোমার জন্য ত প্রথম — রচিত হয়েছিল।

১০। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ঃ— খেয়াতরী, রাজবিদ্রোহী, রাজপথ, নরনারী, পুলিশ-কর্মচারী।

রামদাস স্বামী

সুরেন্দ্রনাথ সেন



['রামদাস স্বামী' বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেনের জীবন চরিত-মূলক, ঐতিহাসিক নিবন্ধ। রামদাস স্বামী সন্ন্যাসী হইয়াও তিনি সংসারের মানুষকে আদর্শের পথে প্রবর্তিত করিতেন। দেশ-সেবা ছিল তাঁহার জীবনের ব্রত। এই প্রবন্ধে তাঁহার মহৎ জীবন ও অমর কীর্তি কাহিনীর কথা বলা হইয়াছে।]

রামদাসের পিতৃদত্ত নাম নারায়ণ। পিতার নাম সূর্যাজী পন্ত, মাতার নাম রানুবাঈ ; তিন বৎসরের বড় এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, নাম গঙ্গাধর। মহারাষ্ট্রে জাম্ব গ্রামে ১৫৬০ শকে চৈত্রমাসে রামনবমীর দিনে দ্বিপ্রহরের সময় এই মহা-পুরুষের জন্ম হয়। উভয় ভ্রাতারই অতি অল্প বয়সে উপনয়ন হইয়াছিল। কিন্তু পিতা সূর্যাজী যখন গঙ্গাধরকে শুভদিন দেখিয়া দীক্ষা দিবার আয়োজন করিলেন, সেদিন নারায়ণের চিত্তও বড় চঞ্চল হইয়া উঠিল। পিতার নিকট কিন্তু তাঁহার আবেদন নিষ্ফল হইল, কারণ তিনি তখন নিতান্ত অপরিণত বুদ্ধি বালক। ক্ষোভে দুঃখে নারায়ণ পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করিলেন। পথ চলিতে চলিতে এক নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। তাহার উভয় কূল প্রবল প্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছে, বিপুল কল্লোলে বিরাট জলরাশি প্রবাহিত হইতেছে। কিন্তু নারায়ণ ভয় পাইলেন না। তিনি প্রবল প্রবাহে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

ছয় ক্রোশ সন্তরণ করিতে করিতে সূর্যোদয় হইল ; তখন এক গ্রামের সমীপে তিনি সানন্দে নদীর তীর দেখিলেন। এক ব্রাহ্মণ দয়া পরবশ হইয়া বালককে

একখণ্ড বস্ত্র ও উপবীত দিলেন। নারায়ণ সেই গ্রাম হইতে নদীর তীর ধরিয়া আবার চলিতে লাগিলেন। গোদাবরীর পুণ্যতীরে,—যে স্থানে শ্রীরামের পবিত্র দেউল আছে সেইখানে উপস্থিত হইলেন। এই স্থানে ধ্যান ধারণায় তাঁহার বার বৎসর কাটিয়া গেল। শ্রীরামের বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করিয়া তিনি আবার দেশ পর্যটনে বাহির হইলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইল। তিনি দেশের তৎকালীন অবস্থার যে চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই বড় করুণ।

"ধন-সম্পদ সমস্তই গিয়াছে কেবল দেশমাত্র পড়িয়া আছে, সুতরাং অনেকেরই সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। মানুষের খাইবার ধান্য নাই; লজ্জানিবারণের বস্ত্র নাই, ঘর বাঁধিবার উপাদান নাই, লোকে কি করিবে? লোকে অকুল চিন্তা প্রবাহে পড়িয়া গিয়াছে। প্রাণিমাত্রই দুঃখী; কাহারও সুখ নাই; কঠিন কাল পড়িয়াছে দেখিয়া কেহই আর কোন বিষয়ে মনোনিবেশ করে না।"

এই দারুণ অভাব দেখিয়া রামদাসের হৃদয় হাহাকার করিয়া উঠিল। কিন্তু মহারাষ্ট্রের দুঃখ কেবল এই অন্নকষ্টে পরিসমাপ্ত হয় নাই। দেশের রাজার শাসন নাই, চতুর্দিকে অশান্তি ও উপদ্রব বিরাজমান, নারীর সম্মানও নিরাপদ নহে। অনাহারে কেহ মরিতেছে, কেহ দেশ ত্যাগ করিতেছে, কত গ্রাম পরিত্যক্ত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, সমস্ত শস্য নষ্ট হইয়া যাইতেছে। দেশে তখন সর্বত্রই পশুবলের প্রাধান্য। দৈহিক শক্তির রাজত্ব, বোধ হয়, কখনও সেখানকার লোক এমন অবনতমস্তকে গ্রহণ করেন নাই।

রামদাস সন্ন্যাসী, কিন্তু সংসার বিরাগী নহেন। সংসারের হিতে তিনি আপনাকে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। সুতরাং দেশের এই দুর্দিনে তিনি চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসীই চিরদিন লোক-শিক্ষণের ভারগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই সংসার-বিরাগী। শাস্ত্র হইতে তাঁহারা বৈরাগ্যের উপদেশগুলিই স্বদেশবাসিগণের জন্য বাহির করিতেন। এই শিক্ষায় লোকের মন স্বভাবতঃই কর্মবিমুখ হইয়া উঠিত।

রামদাস বুঝিলেন, দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতেই হইবে। কারণ, ভগবানের মাহাত্ম্য মূর্খ কি করিয়া বুঝিবে? করতালের শব্দে পেট ভরে না। তুলসীর পাতা যতই পবিত্র হউক না, তাহার কাঠে রান্না হয় না; আম, কাঁঠাল, কলা

প্রভৃতির মত তাহাতে সুস্বাদু ফল ফলে না। দেশের আর্থিক অবস্থা দূর করিতে হইলে লোকের নিকট ধর্মের সহিত কর্মেরও মাহাত্ম্য প্রচার করিতে হইবে।

রামদাস এইজন্য একটি নবীন সম্প্রদায় গঠন করিলেন। তাঁহার শিষ্যেরা জনসেবাতেই জীবন নিয়োজিত করিয়াছিলেন। কর্মের ও জ্ঞানের মহিমা বিশেষ করিয়া প্রচার করাই তাঁহাদের জীবনের ব্রত হইয়াছিল। সমর্থ রামদাস স্বামী এই উদ্দেশ্যে একদল শিষ্যকে সুশিক্ষা-প্রদান করিয়া দেশের বিভিন্ন স্থানে মঠ স্থাপন করেন। নবীন সম্প্রদায়ের মঠে দেশ ছাইয়া গেল। রামদাস স্বামী তাঁহার শিষ্যদিগের হস্তে যুগপৎ লোক শিক্ষা ও লোক সেবার ভার দিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, যে ছত্রপতি শিবাজী একদিন দানপত্র লিখিয়া রামদাসকে সমস্ত রাজ্য দান করিয়াছিলেন; রামদাস শিবাজীর রাজ্য শিবাজীকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিয়াছিলেন,—

"তোমারে করিল বিধি ভিক্ষুকের প্রতিনিধি
রাজ্যেশ্বর দীন, উদাসীন ;
পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য ল'য়ে র'বে রাজ্যহীন।"

—মনে রাখিও, আজ হইতে তোমার এ রাজ্য বৈরাগীর রাজ্য, তুমি রাজ্যের সেবক মাত্র। সেইদিন হইতে বৈরাগীর উত্তরীয় মারাঠা সাম্রাজ্যের জাতীয় পতাকা হইয়াছিল। সেই পতাকার পতন ইংরাজের কামানের গোলাতে হয় নাই, তাহার পতন হইয়াছে, মারাঠা জাতি শিবাজী ও রামদাসের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হইয়াছিল বলিয়া।

দেশের দুর্দশা দূর করিবার জন্য তিনি কতকগুলি মঠ স্থাপন করিলেন। তিনি মঠের শৃঙ্খলারক্ষার নিমিত্ত শিষ্যদের কঠিন শাস্তি দিতেন, শিবাজীর দুর্বৃত্ত পুত্র শম্ভুজীকে কু-শাসনের জন্য তীব্র ভৎর্সনা করিতেন, কিন্তু চারিদিকে অসংখ্য নর-নারীর নানাবিধ দুঃখ দেখিয়া তাঁহার অন্তর কাঁদিত।

শিবাজী ও রামদাস উভয়েই দেশভক্ত। উভয়েরই জীবনের আদর্শ এক। সুতরাং পন্হা বিভিন্ন হইলেও তাঁহাদের পক্ষে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া খুবই স্বাভাবিক।

শিবাজীর মৃত্যুর এক বৎসর পরে স্বামী রামদাস দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তিনি শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন,—"আমার শরীর নষ্ট হইল, কিন্তু আমার উপদেশ রহিল, তদনুসারে কাজ করিও, খেদ করিও না।"

তাঁহার শিষ্য পরম্পরা আজিও মহারাষ্ট্রে বর্তমান আছেন। তাঁহারা রামদাসের পূজা করেন, নাম সংকীর্ত্তন করেন, কিন্তু যে দেশসেবা রামদাসের জীবনের ব্রত ছিল, তাহা বোধ হয় তাঁহার অপর কোনও অবতারের জন্য রাখিয়া দিয়াছেন।

অনুশীলনী

১। রামদাস স্বামীর জীবন কথা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২। 'রামদাস সন্ন্যাসী কিন্তু সংসার বিরাগী নহেন।'

—এই কথাটির তাৎপর্য কি? রামদাসের সংসার প্রীতির পরিচয় দাও।

৩। স্বামীজীর সহিত শিবাজীর সম্পর্কের পরিচয় দাও।

৪। স্বামীজীর জীবনের আদর্শ কি ছিল?

৫। 'রামদাস এইজন্য একটি নবীন সম্প্রদায় গঠন করেন।'

—রামদাস কে? তিনি কি জন্য এক নবীন সম্প্রদায় গঠন করেন? এই সম্প্রদায়ের কার্যাবলীর পরিচয় দাও।

৬। প্রসঙ্গ উল্লেখ পূর্বক ব্যাখ্যা লিখ:

(ক) দেশে তখন সর্বত্রই পশুবলের প্রাধান্য।

(খ) করতালের শব্দে পেট ভরে না। তুলসীর পাতা যতই পবিত্র হউক না, তাহার কাঠে রান্না হয় না।

(গ) পালিবে যে রাজধর্ম জেনো তাহা মোর কর্ম,
রাজ্য ল'য়ে র'বে রাজ্যহীন।

(ঘ) সেই পতাকার পতন ইংরাজের কামানের গোলাতে হয় নাই।

৭। সন্ধিবিচ্ছেদ কর: সূর্যোদয়, পর্যটন, প্রত্যর্পণ, নিরাপদ, রাজ্যেশ্বর।

৮। ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় কর:

সানন্দে, ধর্মসম্পদ, রাজ্যহীন, চিন্তাপ্রবাহে, কর্মবিমুখ, রাজধর্ম, পুণ্যতীরে।

৯। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ ঃ বর্ত্তমান, ভর্ৎসনা, পতন, সুশিক্ষা, নবীন, সুখ, কঠিন, অশান্তি, করুণ, উদাসীন, অনুগ্রহ।

১০। শব্দার্থ লিখ ঃ কু-শাসন, বৈরাগী, উত্তরীয়, নাম-সংকীর্ত্তন, মাহাত্ম্য।

১১। বাক্য রচনা কর ঃ উদাসীন, সুস্বাদু, সানন্দে, বিগলিত, অনুগ্রহ।

১২। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ কিন্তু নারায়ণ ভয় পাইলেন না তাহাতে তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইল। অনাহারে কেহ মরিতেছে। আমার শরীর নষ্ট হইল। করতালের শব্দে পেট ভরে না।

১৩। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ (ক) রামদাস বুঝিলেন, দেশে—ব্যবস্থা করিতেই হইবে। কারণ ভগবানের—মূর্খ কি করিয়া বুঝিবে? —শব্দে পেট ভরে না। তুলসীর—যতই পবিত্র হউক না, তাহার—রান্না হয় না।

(খ) দেশের রাজার—নাই, চতুর্দিকে—উপদ্রব—নারীর—ও নিরাপদ নহে।

———



[দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন একাধারে কবি, নাট্যকার ও গীতকার। তবে নাট্যকার হিসাবেই তিনি সুবিখ্যাত। এই নাট্যাংশ তাঁহার বিখ্যাত 'প্রতাপ-সিংহ' নাটকের শেষ দৃশ্য। অস্তগামী মেবার-সূর্য প্রতাপ সিংহের মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাসে দৃশ্যটি অত্যন্ত করুণ।]

প্রতাপ—পৃথ্বীরাজ! এও সইতে হোল! সম্রাটের কৃপা!

পৃথ্বী—কৃপা নয়, প্রতাপ!—ভক্তি।

প্রতাপ—পৃথ্বী অপলাপ করছ কেন? ভক্তি নয়, কৃপা! আমি হতভাগ্য, দুর্বল, পীড়িত, শোকাবসন্ন। সম্রাট তাই আমাকে আর আক্রমণ করবেন না। শেষে মরবার আগে এও সহিত হোল! উঃ—গোবিন্দ সিংহ!

গোবিন্দ—রাণা!

প্রতাপ—আমাকে এই শিবিরের বাইরে একবার নিয়ে চল। মরবার আগে একবার আমার চিতোরের দুর্গ দেখে নিই।

গোবিন্দ কবিরাজের দিকে সপ্রশ্ন নয়নে চাহিলেন। কবিরাজ কহিলেন—"ক্ষতি কি!"

সকলে মিলিয়া প্রতাপ সিংহের পর্যঙ্ক বহিয়া দুর্গের সম্মুখে রাখিলেন, ইত্যবসরে গোবিন্দ জনান্তিকে কবিরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

—"বাঁচবার কোন আশা নাই ?"

কবিরাজ—কোন আশাই নাই।

(গোবিন্দ মস্তক অবনত করলেন)

প্রতাপ শয্যায় অর্ধোত্থিত হইয়া অদূরে চিতোর দুর্গোপরি চক্ষু স্থাপিত করিয়া কহিলেন—

"ঐ সেই চিতোর। ঐ সেই দুর্জয় দুর্গ। যা' একদিন রাজপুতের ছিল। আজ সেখানে বিদেশীর পতাকা উড়ছে। মনে পড়ে আজ আমার পূর্বপুরুষ স্বর্গীয় বাপ্পারাওকে—তিনি চিতোরের আক্রমণকারী বিদেশীদের পরাস্ত করে তাদের গজনী পর্যন্ত প্রতাড়িত করে গজনীর সিংহাসনে নিজের ভ্রাতুষ্পুত্রকে বসিয়েছিলেন। মনে পড়ে পাঠানের সঙ্গে সেই ঘোর যুদ্ধ, যাতে কাগার নদের নীল বারিরাশি দুই পক্ষের শোণিতে রক্তবর্ণ হয়েছিল। মনে পড়ে পদ্মিনীর জন্য মহাসমর, যাতে বীরনারী চন্দ্রাওৎ রাণী তাঁর ষোড়শ-বর্ষীয় পুত্র ও তাঁর পুত্রবধূর সঙ্গে শত্রুর বিরুদ্ধে প্রাণত্যাগ করেছিলেন!—আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখছি।—ঐ সেই চিতোর! তা উদ্ধার করবো ভেবেছিলাম! কিন্তু পারলাম না। তার পূর্বেই দিবা অবসান হোল, কাজ অসম্পূর্ণ রয়ে গেল।

পৃথ্বী—তার জন্য চিন্তা নাই, প্রতাপ। সকল সময় কাজ একজনের দ্বারা সমাধা হয় না, অসম্পূর্ণ থেকে যায়; কখনও বা পিছিয়ে যায়; কিন্তু আবার একদিন সেই ব্রতের উপযুক্ত উত্তরাধিকারী আসে, সেই অসম্পূর্ণ কাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়, ঢেউয়ের পর ঢেউ আসে, আবার পিছোয়, সমুদ্র ঐরূপে অগ্রসর হয়। দিবার পর রাত্রি আসে আবার দিন আসে; রাত্রি আসে, এইরূপে পৃথিবী-জীবন অগ্রসর হয়। অসীম স্পন্দন ও নিবৃত্তিতে আলোকের বিস্তার! জন্ম ও মৃত্যুতে মনুষ্যের উত্থান। সৃষ্টি ও প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ! কোন চিন্তা নাই।

প্রতাপ—চিন্তা থাকতো না, যদি বীর পুত্র রেখে যেতে পারতাম। কিন্তু—ওঃ—(এই বলিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিলেন)

গোবিন্দ—রাণার কি অত্যধিক যন্ত্রণা হচ্ছে ?

প্রতাপ—হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা দৈহিক নয়, গোবিন্দসিংহ! যন্ত্রণা

মানসিক ! —আমার মনে হচ্ছে যে, আমার মৃত্যুর পরে এ কাজ আবার অনেক পিছিয়ে যাবে ।

গোবিন্দ—কেন, রাণা ?

প্রতাপ—আমার মনে হচ্ছে যে, আমার পুত্র সম্মানের লোভে আমার উদ্ধৃত রাজ্য মোগলের হাতে সঁপে দেবে ।

গোবিন্দ—সে ভয়ের কোন কারণ নেই, রাণা ।

প্রতাপ—কারণ আছে গোবিন্দসিংহ । অমর বিলাসী, এ দারিদ্র্যের বিষ সহ্য করতে পারবে না । তাই ভয় যে, আমি মরে গেলে এ কুটীরের স্থলে প্রাসাদ নির্মিত হবে, আর মেবারের রাণার পরিখা মোগলের পদে বিক্রীত হবে । আর তোমরাও সে বিলাস-প্রবৃত্তির প্রশ্রয় দেবে ।

গোবিন্দ—বাপ্পারাওর নামে অঙ্গীকার করছি, তা কখনো হবে না ।

প্রতাপ—তবে এখন আমি কতক সুখে মরতে পারি । পরে অমরসিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন—"অমরসিংহ, কাছে এসো—আমি যাচ্ছি । শোন ! যেখানে আমি আজ যাচ্ছি, সেখানে একদিন সকলেই যায় । কেঁদো না, বৎস ! আমি তোমাকে একাকী রেখে যাচ্ছি না । আমি তোমাকে তাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, যারা এতদিন সুখে, দুঃখে, পর্বতে, অরণ্যে এই পঁচিশ বৎসর ধরে আমার পার্শ্বে দাঁড়িয়েছিল । তুমি যদি তাদের ত্যাগ না করো তারা তোমায় ত্যাগ করবে না, তারা প্রত্যেকেই প্রতাপসিংহের পুত্রের জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত । আমি তোমাকে সমস্ত মেবার রাজ্য দিয়ে যাচ্ছি,—শুধু চিতোর দিয়ে যেতে পারলাম না, এই দুঃখ রইলো । তোমাকে দিয়ে যাচ্ছি সেই চিতোর উদ্ধারের ভার, আর পিতার আশীর্বাদ—যেন তুমি সে চিতোর উদ্ধার করতে পার । আর দিয়ে যাচ্ছি এই নিষ্কলঙ্ক তরবারি । অমরকে তরবারি প্রদান করিয়া কহিলেন—"যার সম্মান আশা করি, তুমি উজ্জ্বল রাখবে । আর কি বলবো পুত্র ! যাও জয়ী হও, যশস্বী হও, সুখী হও । —এই আমার আশীর্বাদ লও ।"

অমরসিংহ পিতার পদধূলি লইলেন । প্রতাপসিংহ পুত্রকে আশীর্বাদ করিলেন ।

ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া পরে কহিলেন—"জগৎ অন্ধকার হয়ে আসে! কণ্ঠস্বর জড়িয়ে আসে। অমরসিংহ! কোথায় তুমি! এসো প্রাণাধিক। আরো কাছে এসো। তবে যাই—যাই লক্ষ্মী! এই যে আসছি!"

কবিরাজ নাড়ী দেখিলেন। দেখিয়া বলিলেন—"রাণার মানব-লীলা শেষ হইয়াছে। সৎকারের আয়োজন করুন।"

গোবিন্দ—পুরুষোত্তম! মেবার সূর্য! প্রিয়তম! তোমার চিরসঙ্গীকে ফেলে গেলে কোথায়! (বলিতে বলিতে মৃত রাণার চরণতলে লুণ্ঠিত হইলেন।)

(রাজপুত সর্দারগণ নতজানু হইয়া মৃত রাণার পদধূলি গ্রহণ করিল)

পৃথ্বীরাজ—যাও বীর! তোমার পুণ্যার্জিত স্বর্গধামে যাও। তোমার কীর্তি রাজপুতের হৃদয়ে, মোগল হৃদয়ে, মানব জাতির হৃদয়ে চিরদিন অঙ্কিত ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণ-অক্ষরে মুদ্রিত থাকবে, আরাবলির প্রতি চূড়ায়, সন্ধিদেশে, উপত্যকায় জীবিত থাকবে, আর রাজস্থানের প্রতি ক্ষেত্র, বন, পর্বত তোমার অমর স্মৃতিতে পবিত্র থাকবে।

অনুশীলনী

১। প্রতাপসিংহ কে ছিলেন? নাট্যাংশটি হইতে তাঁহার পরিচয় উদ্ঘাটিত কর।

২। 'হাঁ, যন্ত্রণা হচ্ছে। কিন্তু যন্ত্রণা দৈহিক নয়।'
কে কাহাকে কখন এই কথা বলিয়াছিলেন? বক্তার যন্ত্রণার হেতু কি?

৩। 'আজ সে সব যেন প্রত্যক্ষবৎ দেখছি।
কোন্ কোন্ ঘটনা স্মরণ করিয়া বক্তা এই উক্তিটি করিয়াছিলেন?

৪। প্রতাপসিংহের চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

৫। অর্থ লিখ: অপলাপ, পর্যঙ্ক, ব্রহ্মাণ্ড, অঙ্গীকার, নিষ্কলঙ্ক; পুরুষোত্তম কীর্তি।

৬। টীকা লিখ ঃ চিতোর, গজনী, বাপ্পারাও, পদ্মিনী, অমরসিংহ।

৭। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখ ঃ

(ক) অসীমস্পন্দন ও নিবৃত্তিতে আলোকের বিস্তার! জন্ম ও মৃত্যুতে মানুষ্যের উত্থান। সৃষ্টি ও প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের বিকাশ।

(খ) যেখানে আমি আজ যাচ্ছি, সেখানে একদিন সকলেই যায়।

৮। সন্ধি বিচ্ছেদ কর ঃ ভ্রাতুষ্পুত্র, অত্যাধিক, উদ্ধৃত, উজ্জ্বল, পুরুষোত্তম

৯। লিঙ্গান্তর কর ঃ—পীড়িত, বীরপুত্র, উত্তরাধিকারী, বিলাসী।

১০। বিপরীতার্থ শব্দ লিখ ঃ দুর্বল, যুদ্ধ, মৃত্যু, পুণ্য, শব্দ, বিষ।

১১। পদান্তর কর ঃ সমুদ্র, পর্বত দৈহিক, পিতা, অমর।



[প্রাচীন ভারতীয় মনীষার সর্বোত্তম সৃষ্টি উপনিষদ্ । উপনিষদ্ দার্শনিক গ্রন্থ কিন্তু নানাবিধ আকর্ষণীয় অখ্যান উপাখ্যানে পূর্ণ । ব্রহ্মবিদ্ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য এবং ব্রহ্মবাদিনী ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীর উপাখ্যান উপনিষদের একটি বিশিষ্ট উপাখ্যান। সেকালে ঋষিরা গৃহে থাকিয়া ব্রহ্মবিদ্যা আলোচনা ও ধর্মসাধনা করিতেন এবং গার্হস্থ্য জীবন অন্তে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া বনে গমন করিতেন, ঋষি-পত্নীরা গার্হস্থ্য জীবন যাপন করিলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন অমৃতের পূজারিণী। এই উপাখ্যানে ব্রহ্মবাদিনী ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ীর অমৃত-পিপাসার কথাই সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে।]

পুরাকালে ভারতবর্ষে যাজ্ঞবল্ক্য নামে এক অতি প্রসিদ্ধ ঋষি ছিলেন। তাঁহার পুণ্য গৃহস্থাশ্রমে দিগ্ দিগন্তর দেশ দেশান্তর হইতে কত রাজপুত্র, কত ঋষিপুত্র আসিয়া ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ধন্য হইতেন, যাগ-যজ্ঞ, সন্ধ্যা-বন্দনা, ব্রহ্ম বিদ্যার অনুশীলন তাঁহার আশ্রমে নিত্য অনুষ্ঠিত হইত। যাজ্ঞ-বল্ক্যের গৃহ ছিল তখন ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তীর্থ, শিষ্যেরা গুরুসেবা, ধেনুসেবা ও সমিধ—আহরণ করিয়া জ্যোতির্ময় ব্রহ্মচর্য সাধন করিতেন। ঋষি-রাজ গৃহস্থাশ্রমেই পূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন।

যাজ্ঞবল্ক্য ঋষির দুই পত্নী, মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী। ইঁহাদের মধ্যে মৈত্রেয়ী ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী, গৃহ-ধর্ম পালন করিয়াও ব্রহ্মবাদী স্বামীর সঙ্গে

তিনি ব্রহ্মবিদ্যা অনুশীলন করিতেন। দ্বিতীয় স্ত্রী কাত্যায়নীও ছিলেন কুল-লক্ষ্মী সতী সাধ্বী। কিন্তু তিনি সাধারণ গৃহিণীর ন্যায় সংসারের ও স্বামীর সেবা করিয়াই কাল কাটাইয়াছেন, ব্রহ্মজ্ঞান বা ধর্মচর্চার বিশেষ কোন ধার ধারেন নাই।

একদিন যাজ্ঞবল্ক্য দেখিলেন, তাঁহার শরীরে সন্ধ্যার ম্লান দীপ্তি একটু একটু ফুটিয়া উঠিতেছে, পিঙ্গল জটাজাল শাদা হইয়া উঠিয়াছে। শরীর শিথিল হইয়া পড়িতে চাহে। যাজ্ঞবল্ক্যের মনে পড়িল, কবে তাঁহার জন্ম হইয়াছে, সে তো, আজকে নয়, আজকে নয়। ব্রহ্মচর্য সাধনের পরেও কত বর্ষ গৃহধর্মে কাটিয়া গেল। এইবার বাহির হইবার ডাক আসিয়াছে, তাঁহাকে ঘর ছাড়িতে হইবে।

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ। সন্ন্যাস লইবার শেষ বয়স উপস্থিত, আর দেরী করিলে চলিবে না। যাজ্ঞবল্ক্য ব্রহ্মবাদিনী স্ত্রী মৈত্রেয়ীকে ডাকিয়া ধীরে ধীরে বলিলেন,—

"মৈত্রেয়ী, আমার সন্ন্যাস লইবার সময় উপস্থিত, বয়স তো কম হয় নাই। তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে অনুমতি কর, আমি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করি। আমি আশীর্বাদ করি, কাত্যায়নী এবং তুমি—দুটি বোন এই আশ্রমেই অবশিষ্ট কাল সুখে শান্তিতে কাটাইবে।" মৈত্রেয়ী চুপ করিয়া সব শুনিতে লাগিলেন, স্বামী যাহা বলিতেছেন, তাহা তাঁহার ধর্ম ও কর্তব্য, তাই সাধ্বী স্ত্রীর অন্তরে বিচ্ছেদের দুঃখ নিবিড় হইয়া উঠিলেও বাহিরে কিছুই বলিলেন না, কোনও বাধা জন্মাইলেন না। সর্বশেষে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়া উঠিলেন, "এস মৈত্রেয়ী ; পাছে কাত্যায়নীর সঙ্গে তোমার কোনও দিন মনের অমিল হইয়া সংসারের সুখশান্তি নষ্ট হয়, এইজন্য আমার বিষয়সম্পত্তি যাহা কিছু আছে, সমস্তই তোমাকে এবং কাত্যায়নীকে ভাগ করিয়া দেই"। মৈত্রেয়ী কিন্তু আর চুপ করিয়া রহিতে পারিলেন না, তুচ্ছ ধনের জন্য তিনি তাঁহার ভগিনীর সঙ্গে বিরোধ করিবেন। এই তুচ্ছ ধনের লোভ দেখাইয়া স্বামী যখন শান্তির উদ্দেশ্যে সন্ন্যাস লইলেন, তখনও তাঁহাকে ভুলাইয়া শান্ত করিয়া যাইবেন। মৈত্রেয়ী ধীর কণ্ঠে বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ভগবন, এই সমস্ত পৃথিবীই যদি ধন ধান্যে পূর্ণ হয় এবং আমার হয় তাহাতে কি আমি সুখী হইতে পারিব, অমৃত পাইব ?

যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন,—"না না, কখনও না, ধনী লোকের যেমন জীবন,

তোমার জীবনও অবিকল তেমনই হইবে। বিত্তদ্বারা কখনও অমৃতত্ব লাভের আশা নাই।'

এই বিশাল পৃথিবী; চারিদিকে অতল সমুদ্র, মধ্যে অনন্ত অরণ্য—সকলই যদি মণি-রত্ন, সোনা রূপায় ভরিয়া যায় এবং একেশ্বর তুমি যদি এই সকলের মালিক হও, মনের আনন্দে যদি কেবলই যাগ-যজ্ঞ দান-ধ্যান করিতে থাক, যদি তোমার কেবলই ভোগ, কেবলই সুখ হয়, তাতেই বা তোমার কি? তুমি "মানুষ-আনন্দে" আনন্দিত হইতে পার, কিন্তু মৃত্যু তোমাকে ছাড়িবে কেন? অমৃত তুমি পাইবে কোথায়? "বিত্তদ্বারা অমৃতত্বের আশা?"—এই মহাবাক্য মৈত্রেয়ীর কানের ভিতর দিয়া একেবারে মর্মে প্রবেশ করিল, তাঁহার প্রাণ আকুল হইয়া উঠিল। তুচ্ছ ধন, তুচ্ছ বিত্ত, অতি তুচ্ছ এই গৃহ ও সংসার, যদি অমৃতের সন্ধানই এখানে না মিলিল।

মৈত্রেয়ী বৈরাগ্যভরে বলিয়া উঠিলেন,—যাহাতে আমি অমৃত পাইব না, তাহা দিয়া আমি কি করিব? ভগবন্,—আপনি আমাকে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দিন আপনি যাহা জানিয়াছেন, আমাকে সব উপদেশ করুন।"

পড়িয়া রহিল সংসার, পড়িয়া রহিল সন্ন্যাস! কোথায় রহিল বিত্ত বণ্টন! যাজ্ঞবল্ক্য আনন্দাতিশয্যে সব ভুলিয়া গেলেন। এমন বৈরাগ্যময়ী তাঁহার প্রিয়া! তিনি আবেগভরে ডাক দিলেন,—"মৈত্রেয়ী; তুমি যে চিরদিনই আমাদের প্রিয়া! আজ কি প্রিয় কথাই না বলিলে! এস, এস! এখানে আমার নিকটে বস! আমি সব ব্যাখ্যা করিতেছি, তুমি মন দিয়া শোন, তারপর নির্জনে ধ্যান করিও। যাজ্ঞবল্ক্য বলিতে লাগিলেন, আর মৈত্রেয়ী শুনিতে লাগিলেন। যজ্ঞবল্ক্যের কণ্ঠ হইতে আনন্দনির্ঝর ঝরিতে লাগিল আর মৈত্রেয়ী বিভোর হইয়া সে সুধা পান করিতে লাগিলেন। ধন্য মৈত্রেয়ী! ধন্য যাজ্ঞবল্ক্য।

অনুশীলনী

১। মৈত্রেয়ীর মহত্ত্ব বর্ণনা কর।

২। যাজ্ঞবল্ক্য কে? তাঁহার গৃহকে ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ বলা হইয়াছে কেন?

৩। যাজ্ঞবল্ক্যের কয়জন স্ত্রী? তাঁহাদের বৃত্তান্ত যাহা জান লিখ।

৪। 'ভগবন্—আপনি আমাকে অমৃতের সন্ধান বলিয়া দিন।' কে কখন কাহার নিকট এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন? তাঁহার এইরূপ প্রার্থনার কারণ কি?

৫। সপ্রসঙ্গ ব্যাখ্যা লিখঃ (ক) বিত্তদ্বারা কখনও অমৃতত্ব লাভের আশা নাই। (খ) যাহাতে আমি অমৃত পাইব না, তাহা দিয়া আমি কি করিব? (গ) যাজ্ঞবল্ক্যের কণ্ঠ হইতে আনন্দনির্ঝর ঝরিতে লাগিল, আর মৈত্রেয়ী বিভোর হইয়া সে সুধা পান করিতে লাগিলেন।

৬। অর্থ লিখঃ ব্রহ্মবাদিনী, কুললক্ষ্মী, সমিধ্, পিঙ্গল, মর্মে, নির্ঝর।

৭। বাক্য রচনা কর:—
ব্রহ্মচর্য, পিঙ্গল, অন্ত্য, বিষয়সম্পত্তি, ধন-ধান্য, মণি-রত্ন, বিভোর।

৮। সন্ধি বিচ্ছেদ কর:—
আনন্দাতিশয্য, সন্ন্যাস, গৃহস্থাশ্রম, মহোৎসব, একেশ্বর, জ্যোতির্ময়।

৯। কারক বিভক্তি নির্ণয় কর:—

(ক) সমস্ত পৃথিবীই **ধন-ধান্যে** পূর্ণ, (খ) কত **বর্ষ গৃহধর্মে** কাটিয়া গেল। (গ) আমার **সন্ন্যাস** লইবার সময় উপস্থিত। (ঘ) তুমি **'মানুষ—আনন্দে'** আনন্দিত হইতে পার।

১০। ব্যাসবাক্যসহ সমাস লিখ:—
জটাজাল, আনন্দনির্ঝর, ঋষি-রাজ, সুখশান্তি।

১১। শূন্যস্থান পূরণ কর:—
'বিত্তদ্বারা — আশা।' — এই মৈত্রেয়ীর — ভিতর দিয়া একেবারে — প্রবেশ করিল, তাঁহার প্রাণ — হইয়া উঠিল। তুচ্ছধন, — বিত্ত, — তুচ্ছ এই গৃহও — যদি সন্ধানই এখানে না মিলিল।

নির্ভর

রজনীকান্ত সেন



[বাসনাই মানুষের জীনের সকল দুঃখের কারণ। একমাত্র ঈশ্বর নির্ভরতাই মানুষকে বাসনামুক্ত করিতে পারে, ঘুচাইয়া দিতে পারে তাহার মোহ আবরণ। কবি তাই ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া তাঁহার অসীম করুণা প্রার্থনা করিয়াছেন।]

তুমি নির্ম্মল কর, মঙ্গল কর
মলিন মর্ম্ম মুছায়ে ;
তব পুণ্য-কিরণ দিয়ে যাক্ মোর
মোহ কালিমা ঘুচায়ে
লক্ষ্য-শূন্য লক্ষ বাসনা
ছুটিছে গভীর আঁধারে
জানি না কখন ডুবে যাবে কোন
অকূল-গরল-পাথারে।
প্রভু, বিশ্ববিপদহন্তা,
তুমি দাঁড়াও রুধিয়া পন্থা,
তব শ্রীচরণতলে নিয়ে এস, মোর
মত্ত বাসনা গুছায়ে।
আছ অনল-অনিলে, চির-নভোনীলে,
ভূধর সলিলে গহনে,
আছ বিটপিলতায়, জলদের গায়,
শশী-তারকায় তপনে ;
আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া
ব'সে আঁধারে মরি গো কাঁদিয়া
আমি দেখি নাই কিছু, বুঝি নাই কিছু,
দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

অনুশীলনী

১। 'নির্ভর' কবিতাটি আবৃত্তি কর।

২। 'নির্ভর কবিতাটির সারমর্ম লিখ।

৩। বিশদ ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) প্রভু, বিশ্ববিপদহন্তা......মত্ত বাসনা গুছায়ে।

(খ) আমি নয়নে বসন বাঁধিয়া......দাও হে দেখায়ে বুঝায়ে।

৪। শব্দার্থ লিখ ঃ

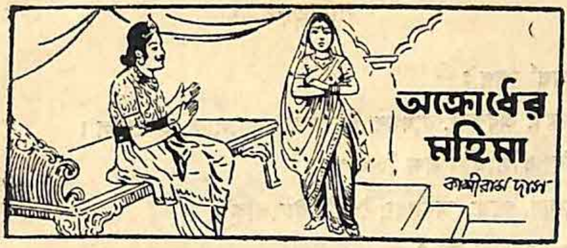
মোহ, পাথারে, পন্থা, ভূধর, গহনে, বিটপি, জলদ।

৫। বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ

মত্ত, লক্ষ্য-শূন্য, কালিমা, গরল, পাথারে।

৬। গদ্যরূপ লিখ ঃ

মুছায়ে, মোর, গছায়ে,



[ক্রোধ মানুষের পরম শত্রু। 'ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়' হয়। ক্রোধই মানুষের জীবনে অশেষ দুঃখ ডাকিয়া আনে। যিনি ক্রোধ জয় করিতে পারেন তিনি সর্বলোকে পূজা পাইয়া থাকেন।]

দ্রৌপদীর বাক্য শুনি ধর্ম-নরপতি।
উত্তর করিলা তাঁরে ধর্মশাস্ত্র-নীতি ॥
ক্রোধ সম পাপ দেবি না আছে সংসারে।
প্রত্যক্ষ শুনহ ক্রোধ যত পাপ ধরে ॥
লঘু-গুরু-জ্ঞান নাহি থাকে ক্রোধ-কালে।
অবক্তব্য কথা লোক ক্রোধ হ'লে বলে ॥
থাকুক অন্যের কথা আত্মা হয় বৈরী।
বিষ খায় ডুবে মরে অস্ত্র অঙ্গে মারি ॥
সে কারণে বুধগণ সদা ক্রোধ ত্যজে।
অক্রোধী যে লোক তারে সর্বলোকে পূজে ॥
ক্রোধে পাপ ক্রোধে তাপ ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধ হেতু মনুষ্যের সর্বনাশ হয় ॥
হেন ক্রোধ যেই জন জিনিবারে পারে।
ইহলোক পরলোক অবহেলে তারে ॥

অনুশীলনী

১। ক্রোধ মানুষের কি অপকার করিয়া থাকে বল।

২। অক্রোধের মহিমা বর্ণনা কর।

৩। ব্যাখ্যা কর ঃ

ক্রোধে পাপ, ক্রোধে তাপ, ক্রোধে কুলক্ষয়।
ক্রোধ হেতু মনুষ্যের সর্বনাশ হয় ॥

৪। অর্থ লেখ ঃ

বৈরী, অবক্তব্য, বন্ধুগণ, ইহলোক, পরলোক, অবহেলে।

৪। বিপরীতার্থক শব্দ লিখ ঃ

ক্রোধ, গুরু, অবক্তব্য, বৈরী, ইহলোক।

৬। বাক্য রচনা কর ঃ

কুলক্ষয়, তাপ, সদা, লঘুগুরু।

৭। গদ্যরূপ লিখ ঃ

উত্তর করিলা, জিনিবারে, অবহেলে, তারে।

৮। মোটা হরফের পদগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় কর।

অক্রোধী যে লোক **তারে সর্বলোকে** পূজে।

———



[মাতৃভাষা বাংলাকে অবহেলা করিয়া কবি মধুসূদন দীর্ঘদিন ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যানুশীলনে নিরত ছিলেন। একদিন কবির স্বপ্ন ভঙ্গ হইল। বিদেশী ভাষার প্রতি তাঁহার মোহ দূর হইল। তিনি উপলব্ধি করিলেন—মাতৃভাষাই তাঁহার কবি-খ্যাতি অর্জনের সহায়ক। মাতৃভাষা ও সাহিত্যানুশীলনে রহিয়াছে—পরম গৌরব। এই কবিতায় কবি তাঁহার অতীত ভুলের জন্য খেদ প্রকাশ করিয়াছেন।]

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন ;
তা' সবে, (অবোধ আমি !) অবহেলে করি,
পর-ধন-লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি'
অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি কায় মন,
মজিনু বিফল তপে অবরণ্যে বরি,
কেলিনু শৈবালে, ভুলি কমল-কানন।
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী ক'য়ে দিল পরে,—
"ওরে বাছা ! মাতৃ কোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি ?
যা ফিরি' অজ্ঞান তুই, যারে ফিরি ঘরে।"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে ; পাইলাম কালে
মাতৃ-ভাষা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।

অনুশীলনী

১। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির খেদের কারণ কি? কবির মোহ কিভাবে দূর হইল, বল।

২। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় কবির বক্তব্যটি বুঝাইয়া বল।

৩। ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) অনিদ্রায় অনাহারে......

......ভুলি কমল-কানন।

(খ) পালিলাম আজ্ঞা......

...পূর্ণ মণিজালে।

৪। অর্থ লিখ ঃ

অবরণ্যে, কেলিনু, কুক্ষণে, কুললক্ষ্মী, মণিজালে।

৫। গদ্যরূপ লিখ ঃ

রতন, করিনু, কয়ে, আজি।

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ঃ

মাতৃকোষে, মণিজালে, কমল-কানন, কুললক্ষ্মী।

৭। মোটা হরফের পদগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ

অনিদ্রায়, অনাহারে, সঁপি **কায়** মন,

মজিনু বিফল **তপে অবরণ্যে** বরি।

———



[এই কবিতায় রাজপুত্র সিদ্ধার্থের অপূর্ব করুণার পরিচয় দেওয়া হইয়াছে। যিনি পরবর্তীকালে জীবের প্রতি করুণাবশতঃ রাজ্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া মহাযোগে নিমগ্ন হইলেন, এইখানে তাঁহার পূর্ববর্তী জীবনের ছবিটি তুলিয়া ধরা হইয়াছে।]

একদিন নিরজনে মনোহর পুরোদ্যানে
সিদ্ধার্থ ভাবিতে ছিলা বসি, অন্যমন।
শুভ্র মেঘ খণ্ড মত রাজহংস শত শত
আনন্দ-লহরীপূর্ণ করিয়া গগন।
যাইছে ভাসিয়া সুখে, হঠাৎ আহত বুকে
একটি কুমার অঙ্কে হইল পতন।
উদ্ধার করিতে শরে, লাগিল কোমল করে,
কুমার বেদনা এই বুঝিল প্রথম,
অধীর হইল প্রাণ, বহিল প্রথম এই
বিশ্বব্যাপী করুণার পুণ্য-প্রস্রবন।
করুণার অশ্রুজলে করুণার পরশনে
হইল বিগত ব্যথা, বাঁচিল মরাল।
কুমার লইয়া বুকে, মুগ্ধা জননীর মত,
চাহি, ক্ষুদ্র মুখপানে রহে কিছুকাল।
কি মহিমা করুণার! কাননের বিহঙ্গেও
বুঝে তাহা, কি মধুর করে প্রতিদান!

উভয়ে উভয়-পানে নীরবে চাহিয়া কিবা
করুণার উভয়ের বিমোহিত প্রাণ।
আসি' দেবদত্ত কহে, "কুমার! এ হংস মম,
মম শরে হ'য়ে হত প'ড়েছে ভূতলে।"
কুমার কহিল ধীরে, "হত জীব হত্যাকারী
পায় যদি ভাই, কোন ধর্ম্ম-শাস্ত্র বলে,
যে দেয় জীবন তারে সে কি তারে পাইবে না ?
হত নহে, এই হংস আহত কেবল।
আঘাতের ব্যথা ভাই আজি বুঝিয়াছি আমি,
হংসের ব্যথায় প্রাণ হয়েছে বিকল।
তোমার তো আছে প্রাণ পাখীটির ক্ষুদ্র প্রাণে,
বুঝ না কি, কি যে ব্যথা পেয়েছে বিষম ?
লও তুমি শাক্য-রাজ্য, আমি নাহি চাহি তাহা,
এ হংস আমার, আমি দিব না কখন।"
শাক্য-পুত্র দেবদত্ত স্তম্ভিত, বিস্মিত-চিত্ত,
দেখিল—কুমার নহে, মূর্ত্তি করুণার!
ফিরিল নীরবে গৃহে, উড়িল মরাল সুখে,
কলকণ্ঠে এ করুণা করিয়া প্রচার।

অনুশীলনী

১। এই কবিতাটিতে কুমার সিদ্ধার্থের হৃদয়ের পরিচয় দাও।

২। 'দেবদত্ত স্তম্ভিত, বিস্মিত চিত্ত'
—দেবদত্ত কে ? তিনি স্তম্ভিত, বিস্মিত-চিত্ত কেন ?

৩। 'কি মহিমা করুণায়'
—করুণার মহিমা বর্ণনা কর।

৪। ব্যাখ্যা কর:
(ক) কুমার কহিল ধীরে......
......সে কি তারে পাইবে না ?

(খ) লও তুমি শাক্য রাজ্য······

······দিব না কখন।

৫। অর্থ লিখ :

লহরী, অঙ্কে, প্রস্রবন, প্রতিদান, শাস্ত্রবলে, মরাল, কলকণ্ঠে।

৬। বাক্যে প্রয়োগ কর :

শুক্র, অধীর, প্রতিদান, বিকল, বিষম।

৭। গদ্যরূপ লিখ :

নিরজনে, পরশনে, মম, তারে।

৮। পদ-পরিবর্তন কর :

করুণা, আহত, মনোহর, ক্ষুদ্র, নীরবে, বিকল।

৯। সন্ধি বিচ্ছেদ কর :

মনোহর, পুরোদ্যানে, নীরবে।



[শরৎকালে বাংলার রূপ-সৌন্দর্যের রমণীয় বর্ণনা ।]

আজি কী তোমার মধুর মুরতি
হেরিনু শারদ প্রভাতে
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অঙ্গ
ঝলিছে, অমল শোভাতে ।
পারে না বহিতে নদী জলধার,
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর—
ডাকিছে দোয়েল, গাহিছে কোয়েল
তোমার কানন সভাতে ।
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননী,
শরৎকালের প্রভাতে ।
জননী, তোমার শুভ আহ্বান
গিয়েছি নিখিল ভুবনে—
নূতন ধান্যে হবে নবান্ন
তোমার ভবনে ভবনে ।
অবসর আর নাহিক তোমার,
আঁটি-আঁটি ধান চলে ভারে ভার,
গ্রাম পথে-পথে গন্ধ তাহার
ভরিয়া উঠিছে পবনে ।
জননী, তোমার আহ্বানলিপি
পাঠায়ে দিয়েছ ভুবনে

তুলি মেঘভার আকাশ তোমার
করেছ সুনীল বরনী ;
শিশির ছিটায়ে করেছে শীতল
তোমার শ্যামল ধরণী।
স্থলে জলে আর গগনে গগনে
বাঁশি বাজে যেন মধুর লগনে,
আসে দলে দলে তব দ্বারতলে
দিশি দিশি হতে তরণী।
আকাশ করেছ সুনীল অমল,
স্নিগ্ধ শীতল ধরণী।
বহিছে প্রথম শিশির সমীর
ক্লান্ত শরীর জুড়ায়ে—
কুটিরে কুটিরে নব নব আশা
নবীন জীবন উড়ায়ে।
দিকে দিকে, মাতা, কত আয়োজন—
হাসিভরা-মুখ তব পরিজন
ভাণ্ডারে তব সুখ নব নব
মুঠা মুঠা লয় কুড়ায়ে।
ছুটেছে সমীর আঁচলে তাহার
নবীন জীবন উড়ায়ে।
মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য।
গন্ধে ভরিছে অবনী।
জলহারা মেঘ আঁচলে খচিত
শুভ্র যেন সে নবনী।
পরেছে কিরীট কনককিরণে,
মধুর মহিমা হরিতে হীরণে,
কুসুম ভূষণ জড়িত চরণে
দাঁড়ায়েছে মোর জননী।
আলোকে শিশিরে কুসুমে ধান্যে
হাসিছে নিখিল অবনী।

অনুশীলনী

১। 'শরৎ'-কবিতাটির অনুসরণে শরৎ কালে বাংলার রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

২। শরৎকালে বাংলার ঘরে ঘরে যে আশা আনন্দের সঞ্চার হয় তাহার পরিচয় দাও।

৩। কবিতাটি আবৃত্তি কর ঃ

৪। ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) মাতার কণ্ঠে শেফালিমাল্য……শুভ্র যেন নবনী।

(খ) কুসুম ভূষণে জড়িত চরণে……নিখিল অবনী।

৫। শব্দার্থ লিখ ঃ

অমল, নবান্ন, দিশি, হিরণে, পরিজন।

৬। বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ

শ্যামল, অমল, শুভ, নিখিল, হাসিভরা, কণ্ঠে।

৭। পদ পরিবর্তন কর ঃ

শুভ্র, নবীন, মধুর, স্নিগ্ধ, গ্রাম।

৮। গদ্যরূপ লিখ ঃ

মুরতি, হেরিনু, ঝলিছে, দিশি, হরিতে।

৯। মোটা হরফের পদগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ

নূতন **ধান্যে** হবে নবান্ন তোমার **ভবনে ভবনে**।
আলোক শিশিরে কুসুমে ধান্যে হাসিছে নিখিল **অবনী**।



[জ্যোৎস্না-বিধৌত রাত্রিতে কর্মক্লান্ত মমতাময়ী মাতা ও নয়নানন্দ শিশুর এক অনিন্দ্যসুন্দর বাৎসল্য চিত্র—এই কবিতাটি ।]

ফুটফুটে জোছনায়   ধব্‌ধবে আঙিনায়
একখানি মাদুর পাতিয়ে,
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে   জননী শুইয়া আছে
গৃহকাজে অবসর পেয়ে ।
মৃদু ঝুরু ঝুরু বায়   বসন কাঁপায়ে যায়
ঝরে পড়ে কামিনীর ফুল ।
প্রশান্ত মুখের 'পরে   কালো কেশ উড়ে পড়ে,
আলসেতে আঁখি ঢুল্‌ঢুল্‌ ।
মাতা মৃদু ধীর হাতে   আঘাতে শিশুর মাথে,
গায় ঘুম-পাড়ানিয়া গান ;
মোহিয়া সুস্বর ভাষে,   আকুল কি ফুলবাসে,
পিঞ্জরে ধরেছে পাখী তান ।
শিয়রেতে জেগে শশী   যেন সে সৌন্দর্যরাশি
নেহারিছে মগ্ন হয়ে ভাবে ।
ছেলে ডাকে, "আয় চাঁদ,"   মা বলিছে, "আয় চাঁদ,"
কি করিবে চাঁদ মনে ভাবে ।
মা নাহি ঘরেতে যার,   ছেলে কোলে নাই যার,
যত-কিছু সব তার মিছে ।
চাঁদে চাঁদে হাসা হাসি   চাঁদে চাঁদ মেশামেশি—
স্বর্গে মর্তে প্রভেদ কি আছে !

অনুশীলনী

১। এই কবিতায় কবি মা ও ছেলের যে রূপচ্ছবি আঁকিয়াছেন তাহার পরিচয় দাও।

২। ব্যাখ্যা কর ঃ (ক) মা নাহি ঘরেতে যার•••

সব তার মিছে।

(খ) চাঁদে চাঁদে হাসাহাসি···

প্রভেদ কি আছে?

৩। শব্দার্থ লিখ ঃ আঙিনায়, অবসর, প্রশান্ত, সুস্বর, নেহারিছে।

৪। বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ ধবধবে, ঢুলঢুলু, ফুটফুটে, হাসাহাসি।

৫। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ঃ হাসাহাসি, মেশামেশি, গৃহকাজে, সুন্দর।

৬। মোটা হরফের পদগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ

ফুটফুটে **জোছনায়** ধবধবে **আঙিনায়**
একখানি **মাদুর** পাতিয়ে
ছেলেটি শুয়ায়ে কাছে **জননী** শুইয়া আছে
গৃহকাজে অবসর পেয়ে।

৭। গদ্যরূপ লিখ ঃ

জোছনায়, আঙিনায়, পাতিয়ে, বায়, নেহারিছে।

ভারতের মানচিত্র

—যোগীন্দ্রনাথ বসু

[ভারত আমাদের পুণ্য জন্মভূমি। ইহার প্রতি ধূলিকণা আমাদের নিকট অতি পবিত্র। ইহার অতীত ইতিহাস গৌরব-পূর্ণ। অতীতের গৌরব-স্মৃতি বক্ষে ধারণ করিয়া নিজকর্ম দ্বারা মাতৃভূমির মুখ উজ্জ্বল করিতে হইবে।]

হেরো বৎস, সম্মুখেতে প্রসারিত তব
ভারতের মানচিত্র, আমা সবাকার
পুণ্য জন্মভূমি এই। মাতৃস্তন্যে যথা,
এ দেশের ফলে জলে পালিত আমরা।
করো প্রণিপাত তুমি, করো প্রণিপাত।
রত্নপ্রসূ মা মোদের। দেখিয়াছ তুমি
দেব-আত্মা হিমাচল, পাদ-মূলে তাঁর
দেখো শীর্ণকায়া ওই বহিছে রোহিনী,
হিমাদ্রি-দুহিতা সতী। তটদেশে তার
আছিল কপিলাবস্তু, পুণ্যময়ী পুরী
সিদ্ধার্থে ধরিয়া ক্রোড়ে। দেখো বাম দিকে
অর্দ্ধচন্দ্র-কায়া ওই জাহ্নবীর কুলে,
শোভিতেছে বারাণসী, হরিশচন্দ্র যথা
পত্নী পুত্রে আপনারে করিয়া বিক্রয়
পালিলেন নিজ সত্য। দেখো শিপ্রাকুলে
অতীত-গৌরব-স্মৃতি-শিলা ধরি বুকে,
শোভিতেছে উজ্জয়িনী—বিক্রমের পুরী—
বাজায়ে মধুর বীণা কালিদাস যেথা
গাহিলা অমর গীত, ঝংকার তাহার
এখনো উঠিছে, বৎস, দেশ-দেশান্তরে।
কি আর অধিক কব? সন্তানের কাছে
জননীর প্রতি অঙ্গ তুল্য আদরের—

নয়নে অমৃত-দৃষ্টি, কণ্ঠে মধুবাণী,
হৃদয়ে সুধার উৎস, ক্রোড় শান্তিময় ;
করে প্রাণরূপী অন্ন, মহাতীর্থ পদ।
তেমতি জানিয়ো বৎস, ভারত-ভূমির
প্রতি গিরি, প্রতি নদী, প্রতি জনপদ
পুণ্যময় মহাতীর্থ ; আছে বিমিশ্রিত
প্রতি রেণুমাঝে এর, প্রতি জলকণে,
সাধুর পবিত্র অস্থি, সতীর শোণিত।
সামান্য এ দেশ নয় ! বহু পুণ্য ফলে
জন্মে নর এ ভারতে ! কিন্তু চিরদিন
রাখিয়ো স্মরণ বৎস, কর্মগুণে যদি
নাহি পার উজ্জ্বলিতে মাতৃভূমি-মুখ,
বৃথাই জনম তব। কি বলিব আর !

অনুশীলনী

১। ভারতের ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্থানগুলির মহিমা বর্ণনা কর।

২। কবি জননীর সহিত মাতৃভূমির তুলনা করিয়াছেন কেন ?

৩। মাতৃভূমির প্রতি সন্তানের কর্তব্য কি ?

৪। ব্যাখ্যা লিখ ঃ—রাখিয়ো স্মরণ বৎস···বৃথাই জন্ম তবে।

৫। শব্দার্থ লিখ ঃ অস্থি, প্রণিপাত, রত্নপ্রসূ, দেব-আত্মা, হিমাদ্রী, রেণুমাঝে, শোণিত।

৬। টীকা লিখ ঃ কপিলাবস্তু, হরিশচন্দ্র, উজ্জয়িনী, কালিদাস, বারাণসী।

৭। মোটা হরফের পদগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ

(ক) বহু **পুণ্যফলে** জন্মে নর **এ ভারতে**

(খ) **কর্মগুণে** যদি নাহি পার উজ্জ্বলিতে **মাতৃভূমি মুখ**, বৃথাই জন্ম তব।

ছাত্রদলের গান

কাজী নজরুল ইসলাম



[ছাত্ররাই জাতীয় জীবনের আশা ভরসা, তাহারাই দেশের শক্তি সাহসের উৎস। তাহারাই যুগে যুগে প্রাণ বিসর্জন দিয়া দেশ ও জাতির মঙ্গল সাধন করিয়াছে, অফুরন্ত কর্মশক্তির দ্বারা দেশের দুর্দিনের অবসান ঘটাইয়াছে। এই কবিতায় ছাত্রদের সেই অমর কীর্তির কথা ঘোষিত হইয়াছে।]

আমরা শক্তি আমরা বল
আমরা ছাত্রদল ॥
মোদের পায়ের তলায় মূর্ছে তুফান, উর্ধ্বে বিমান ঝড়-বাদল
আমরা ছাত্রদল ॥

মোদের আঁধার রাতে বাধার পথে যাত্রা নাঙা পায়,
আমরা শক্ত মাটি রক্তে মোদের সিক্ত হল পৃথ্বীতল।
আমরা ছাত্রদল ॥

মোদের কক্ষচ্যুত-ধূমকেতু-প্রায় লক্ষ্যহারা প্রাণ,
আমরা ভাগ্যদেবীর যজ্ঞবেদীর নিত্য বলিদান।
যখন লক্ষ্মীদেবী স্বর্গে ওঠেন আমরা পশি নীল অতল,
আমরা ছাত্রদল ॥

মোদের চক্ষে জ্বলে জ্ঞানের মশাল বক্ষে ভরা বাক্।
কণ্ঠে মোদের কুণ্ঠাবিহীন নিত্য কালের ডাক।
আমরা তাজা খুনে লাল করেছি সরস্বতীর শ্বেত কমল।
আমরা ছাত্রদল ॥

ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে আমরা দানি শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে বিংশ শতাব্দীর।
মোরা গৌরবেরি কান্না দিয়ে ভরেছি মার শ্যাম-আঁচল।
আমরা ছাত্রদল ॥

অনুশীলনী

১। কবিতাটির হইতে ছাত্রদের কীর্তি কথা বর্ণনা কর।

২। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

৩। ব্যাখ্যা কর:

(ক) মোদের বক্ষে জ্বলে......

......শ্বেত কমল।

আমরা ছাত্রদল।

(খ) ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে......

......আমরা ছাত্রদল।

৪। শব্দার্থ লিখ: নাঙা, ধূমকেতু মশাল, কালের ডাক, উপপ্লব।

৫। ব্যাসবাক্য সহ সমাস নির্ণয় কর:—কক্ষচ্যুত, লক্ষ্যহারা, ঝড়-বাদল, যজ্ঞবেদী, শ্যাম-আঁচল।

৬। বাক্যে প্রয়োগ কর:—শির, তুফান, অতল, শ্বেত কমল, কক্ষচ্যুত।

দেশের মাটি

—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

[বাংলা দেশের রূপ-সৌন্দর্যের বর্ণনা ।]

মধুর চেয়েও আছে মধুর—
সে এই আমার দেশের মাটি,
আমার দেশের পথের ধূলা
খাঁটি সোনার চাইতে খাঁটি ।
চন্দনেরি গন্ধভরা,
শীতল-করা,—ক্লান্তি-হরা,
যেখানে তার অঙ্গ রাখি
সেখান্‌টিতেই শীতল পাটি !
শিয়রে তার সূর্য এসে
সোনার কাঠি ছোঁয়ায় হেসে,
নিদ্‌মহলে জ্যোৎস্না নিতি
বুলায় পায়ে রূপার কাঠি !
নাগের বাঘের পাহারাতে
হচ্ছে বদল দিনে রাতে,
পাহাড় তারে আড়াল করে,
সাগর সেতার ধোয়ায় পা'টি ।
মউল ফুলের মাল্য মাথায়,
লীলার কমল গন্ধে মাতায়,
পাঁয়জোরে তার লবঙ্গ-ফুল
অঙ্গে বকুল আর দোপাটি ।
নারিকেলের গোপন কোষে
অন্নপানী জোগায় গো সে,
কোলভরা তার কনক ধানে
আট্‌টি শীষে বাঁধা আঁটি ।

সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি,
সেই তো রে নীলকণ্ঠ পাখী,
মুক্তি-সুখের বার্তা আনে
ঘুচায় প্রাণের কান্নাকাটি।

অনুশীলনী

১। বাংলা দেশের রূপ সৌন্দর্যের বর্ণনা দাও।

২। কবিতাটি আবৃত্তি কর।

৩। ব্যাখ্যা কর ঃ

(ক) নাগের বাঘের...

...ধোয়ায় পাটি।

(খ) সে যে গো নীল-পদ্ম-আঁখি···

...প্রাণের কান্নাকাটি

৪। শব্দার্থ লিখ ঃ

ক্লান্তি ভরা, সোনার কাঠি, নিদ্‌মহলে, পাঁয়জোরে, নীলকণ্ঠ পাখী।

৫। গদ্যরূপ লিখ ঃ—
নিতি, ধোয়ায়।

৬। ব্যাসবাক্যসহ সমাস নির্ণয় কর ঃ
গন্ধভরা, অন্নপানী, নীল-পদ্ম-আঁখি।

———

ফেরে ভন্ ভন্ মশা দলে দলে, বুড়ো পাতা ঝরে বনে,
ফোঁটায় ফোঁটায় পাতা-চোঁয়া জল ঝরিছে তাহার সনে।
পার্শ্বে কাঁপিছে মাটির প্রদীপ, এখনি নিভিবে বুঝি,
ফুরায়ে এসেছে তৈল তাহার আঁধারের সাথে যুঝি'।

অনুশীলনী

২। পল্লীজননী' কবিতা হইতে মাতৃহৃদয়ের উদ্বেগ আশঙ্কার পরিচয় দাও।

২। কবিতাটির অনুসরণে গ্রাম বাংলার রাত্রির রূপটি বর্ণনা কর।

৩। পদ পরিবর্তন কর ঃ

নিঝুম, বুনো, শীতল, সংসার, বুড়ো, মাটি, জল।

৪। বাক্যে প্রয়োগ কর ঃ

বুনো, নিঝুম, দরগা, বালাই, অকল্যাণ, ছোটখাটো।

৫। লিঙ্গ পরিবর্তন কর ঃ

মাতা, ছেলে, গরীব, দূত, মা, বুড়ো।

৬। ব্যাসবাক্য সহ সমাস লিখ ঃ

ঘনঘোর, অকল্যাণ, নয়ন-নীর, হিয়া-কাণে, পাতা-চোঁয়া।

৭। মোটা হরফের পদগুলির কারক-বিভক্তি নির্ণয় কর ঃ

(ক) এঁধো **ডোবা** হতে বহিছে বাতাস পচানো পাতার **ঘ্রাণ**।

(খ) নামাজের ঘরে **মোমবাতি** মানে, **দরগায়** মানে দান।

(গ) ছোটখাটো কত **বায়না** ছেলের পারে নাই মিটাবারে।

৮। অর্থ লিখ ঃ

ঘনঘোর, দরগায়, নয়ন-নীর, শিয়রে, হিয়া কোণে।

৯। গদ্যরূপ লিখ ঃ আঁধিয়ার, বেঁধেছে, গনিছে, ভাসে, এল, করে, ঝরিছে ফুরায়ে।

১০। শূন্যস্থান পূরণ কর ঃ

রাত থম্ থম্ শব্দ——, ঘনঘোর——,
নিশ্বাস পড়ে, তাও শোনা যায়——চারিধার।



[কবিতাটি নববর্ষের রূপ সৌন্দর্য-আনন্দের রসসিক্ত বর্ণনা ।]

(১)

মধুযামিনীর শেষ দীপশিখা নিভে গেল দূর বনে,
কে তুমি আসিলে নবফুলরথে, প্রভাত মধুর লগনে ?
নবপল্লব কুন্তলভার
গলে দোলে শুভ বনফুলহার
চম্পকদল সিতশতদল-খচিত অরুণ বসনে,
আসিলে হে প্রিয়, অপরূপ বেশে পুলক চপল ভুবনে ॥

(২)

আজি বৈশাখের কনক কিরণে হাসিতেছে চারিধার,
দিকে কত আনন্দপ্লাবন, ক্রীড়াগীতি অনিবার ।
আকাশে হাসিছে কনক তপন
বনে বনে উঠে বিহগ কুজন
নরনারী জীব পুলকমগন, সুখ হাসি পারাবার ।
বিশ্ববীণায় মধুগীতি বাজে, উঠে নব ঝঙ্কার ॥

(৩)

হে সুন্দর, তুমি এলে নবরূপে কনককিরণ রথে,
জলে স্থলে তাই রূপের মাধুরী, ঝরে হাসি পথে পথে ।
বারে বারে তুমি আস, চলে যাও
জীবনের গান কানেতে শোনাও

ধরি ধরি তোমা' ধরা নাহি দাও, চলে যাও ফুলরথে,
জগতের যত হাসি ক্রন্দনে ফুলঝরা বনপথে ॥

(৪)

আজি প্রিয়তম, আসিলে ভুবনে কনক মুকুট শিরে,
ঘুচাও আঁধার, নয়নের জল,—আলোকে দাওগো ঘিরে।
দূর কর পাপ কলঙ্ক কাজল
ঢাল সুধাহাসি, শান্তি নিরমল
দীনহীন কবি, আঁকি তব ছবি, পূজি তোমা' অশ্রুনীরে।
জয় হোক তব, সুখ অভিনব, নমি দেব, নতশিরে ॥

অনুশীলনী

১। 'নববর্ষ'-এর আগমনে প্রকৃতির আনন্দের বর্ণনা কর।

২। কবি 'নববর্ষ'কে কিভাবে বন্দনা করিয়াছেন, বল।

৩। 'হে সুন্দর, তুমি এলে নবরূপে'
সুন্দর কে? তাহার নবরূপ বর্ণনা কর।

৪। ব্যাখ্যা কর :—

(ক) নরনারী জীব পুলক মগন, সুখ হাসি পারাবার।
বিশ্ববীণায় মধুগীতি বাজে, উঠে নব ঝংকার।

(খ) দীন হীন কবি, আঁকি তব ছবি, পূজি তোমা অশ্রুনীরে।
জয় হোক তব, সুখ অভিনব, নমি দেব, নতশিরে।

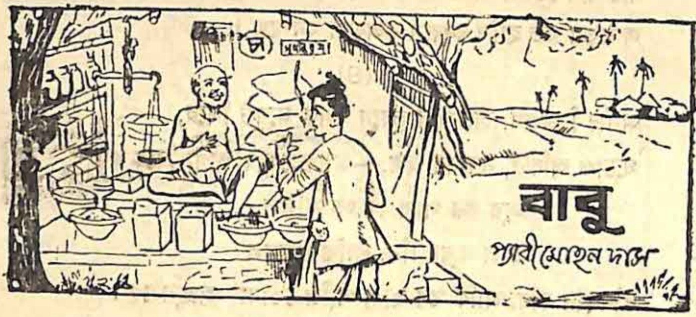
৫। শব্দার্থ লিখ : মধুযামিনী, নবপল্লব, সিত, কুজন, ঝঙ্কার।

৬। বাক্যে প্রয়োগ কর :—কুন্তলভার, চপল, পুলকমগন, কনক।

৭। পদ পরিবর্তন কর : শান্তি, বন, মাধুরী, হাসি, জগৎ।

৮। শূন্যস্থান পূরণ কর :—

আজি—কনক—হাসিতেছে—দিকে দিকে কত—, ক্রীড়াগীতি ;—আকাশে হাসিছে——বনে—উঠে—কুজন।



[বসনে ভূষণে সুসজ্জিত এক ধনী যুবকের বিড়ম্বিত কাহিনী]

নম্বরি ধুতি পরা, ফুটফুটে জামা গায়।
হাতে বাঁধা রিস্টওয়াচ, কাবুল স্যান্ডেল পায়।
পথবেয়ে যান্ বাবু, সিগারেট দিয়ে টান।
রামমুদি ডাকে তারে, বাবু বাবু শুনে যান।
পকেটে ফাউনটেন পেন, আঁটাছিল তিনটা।
মুদি ভাবে ভালকথা, জেনে রাখি দিনটা॥
কাগজের ফাইলটা, হাতে করে, তাড়াতাড়ি।
বিবরণ কহে রামা বাবুর সম্মুখে ধরি॥
মামলার তারিখটা মুহুরি দিয়েছে লিখে।
দয়া করে বলে দিন, রোকার লেখাটা দেখে॥
বাবু বলে ওরে বাপু এখন উপায় নাই।
চশমাটা ছেড়ে আসা, এও যে দেখি বালাই॥
হাঁফ ছেড়ে বলে বাবু আছে খুব জরুরী।
মুদি মনে মনে ভাবে, ওটা শুধু চাতুরী॥
অবাক বিস্ময়ে চাহে, দোহে দোহাকার দিকে।
কি ভুল করেছি মোরা লেখাপড়া না শিখে॥

অনুশীলনী

১। বাবু কাহাকে বলা হয় ? 'বাবুর জীবনের বিড়ম্বনার দিকটা উদ্ঘাটন কর।

২। অবাক বিস্ময়ে চাহে, দোহে দোহাকার দিকে।
কে কাহার দিকে চাহিয়াছিল ? তাহাদের বিস্ময়ের কারণ কি ?

৩। ব্যাখ্যা কর : মামলার তারিখটা......দেখি বালাই।

৪। বাক্যে প্রয়োগ কর :—চাতুরী, জরুরী, বাপু, বালাই।



[নিজের জীবন আহুতি দিয়া তানাজী কিভাবে সিংহগড় দুর্গ মোগলের হাত হইতে ছিনাইয়া লইলেন—এই কবিতায় সেই অপূর্ব কাহিনী বিবৃত হইয়াছে ।]

উম্‌রাটিপুরে সুবেদার-গৃহে সেদিন বাজিছে বাঁশি,
তানাজী-পুত্র রায়বার বিয়ে ; প্রমত্ত পুরবাসী ;
নানা আয়োজন, ভারি ধুমধাম ; নৃত্য ও গীত চলে অবিরাম,
দাঁড়াইল বর— বাজিল শঙ্খ, জ্বলিল আলোকরাশি—
এ হেন সময় শিবাজীর দূত সভায় দাঁড়াল আসি ।
পাঠ করি লিপি বজ্রকণ্ঠে হাঁকিল মালেশ্বর—
"নামাও বংশী, থামাও নৃত্য, সাজ খুলে ফেলো বর !
কঠিন বিবাহ ঘনায়েছে আজ তারি লাগি সবে পরো নব সাজ ;
সেই মিলনের শুভ লগ্নের সময় অগ্রসর—
রে বরযাত্রি ! আগত রাত্রি—হও সবে সত্বর !"
লিপির বারতা শুনিল সকলে সাগ্রহে পাতি কান,
হাজার কণ্ঠে ধ্বনিল অমনি শিবাজীর আহ্বান ।
অন্তঃপুরে পুরনারী যত শুনিল সে বাণী স্বপ্নের মতো,
বিস্ময়-হত হিয়া শত শত, তবু নহে ম্রিয়মান,
নব-উৎসাহে উঠিল জ্বলিয়া পদাহত সম্মান ।
বারো সহস্র মাওয়ালী সৈন্য সাজিল বারতা পেয়ে,
তাই লয়ে সাথে প্রচণ্ড তেজে চলিল তানাজী ধেয়ে ।

রায়গড়ে আসি রাজারে শুধায়—"কি আদেশ প্রভু, ঘটিল কি দায় ?"
উত্তরে শুধু কহিল শিবাজী—জননীর পানে চেয়ে,
"আমি ডাকি নাই, ডেকেছেন তোমা—ভবানী মায়ের মেয়ে"।

জননী অমনি তানাজীর মুখে ঘুরায়ে প্রদীপখানি,
অঙ্গুলি ভাঙি ললাট পরশি বালাই লইয়া টানি
কহিল মধুর-গম্ভীর-রবে "সিংহগড় মোরে জিনে দিতে হবে,
বৎস আমার ! আজ হ'তে তোরে দ্বিতীয় পুত্র মানি।"
তানাজীর মুখে অপূর্ব সুখে বন্ধ হইল বাণী !......
হাঁকি পুনরায় কহে জীজাবাই, "ছি ! ছি ! তোরা কাপুরুষ !
বীরের কর্ম আপন ধর্মে করে সে নিষ্কলুষ।
বেদ ব্রাহ্মণ নিষ্ঠা আচার ধর্ম যজ্ঞ বিবেক বিচার—
চরণে দলিত হেরি বারবার, তথাপি হয়না হুঁশ—
ধিক্কারে ভরা লাঞ্ছনা তোরা মর্মে লুকায়ে থুস্ !......
"তাই থাক্ তোরা লজ্জা লুকায়ে অন্ধ বিবর মাঝে,
থাক বারোমাস মোগলের দাস ঘৃণ্য অধম কাজে,
আমি যাই—মোর ফুরায়েছে কাল, মিছে বেঁচে থাকা হয়ে জঞ্জাল,
আপনার মান পরেরে বিকায়ে লাঞ্ছনাভরা লাজে"
সিংহগড়ের দুর্গে আজিকে মোগল-ডঙ্কা বাজে।'
রুদ্ধকণ্ঠে কহিল তানাজী—"তাই হবে তাই হবে—
ফিরায়ে আনিব সিংহগড়ের নির্জিত গৌরবে ;
শপথ করিনু অসি ছুঁয়ে আজ, ঘুচাব রাষ্ট্র-কলঙ্ক লাজ,
অথবা পরান সঁপি দিব আজ মরণ-মহোৎসবে—
ক্ষয়-ক্ষতি-লাজ ডুবাইব আজ বিজয়ের তাণ্ডবে !"

পরশিয়া পুনঃ মায়ের চরণ চলি গেল বীর ধীরে,
বারো সহস্র মাওয়ালি সৈন্য চলিল সঙ্গে ঘিরে।
সিংহগড়ের দুর্গচূড়ায় সূর্য তখন স্বর্ণকুড়ায়,
সন্ধ্যা তাহার রক্ত ছড়ায় "ডঙ্গী"—শৈলশিরে,
দূরে সেনা রাখি চলিল তানাজী পাহাড়ের কোল ভিড়ে।

সপ্তাহ পরে এল রায়গড়ে সিংহগড়ের চর ;
শুনিল সকলে সভয়ে গর্বে জয় সে ভয়ংকর ।
জিজাবায়ে শুধু কহিল শিবাজী—"সিংহগড়, মাতা, ফিরি লও আজি ;
সিংহগড়ের সিংহ গিয়েছে—পড়ে আছে শুধু গড়—
তাই লও মাতা, হারায়ে পুত্র—তানাজী মালেশ্বর !"

অনুশীলনী

১। তানাজীর সিংহগড় দুর্গ বিজয়ের কাহিনী বর্ণনা কর।

২। 'নামাও বংশী, থামাও নৃত্য সাজ খুলে ফেল বর'।
—কে, কখন এই কথা বলিয়াছিলেন ?

৩। 'আমি ডাকি নাই, ডেকেছেন তোমা—ভবানী মায়ের মেয়ে'।
—কে, কাহাকে, কখন এই কথা বলিয়াছিলেন ? 'ভবানী মায়ের মেয়ে' কে ? তিনি সমাগত ব্যক্তিটিকে কি বলিয়াছিলেন ?

৪। ব্যাখ্যা লিখ : (ক) তাই থাক তোরা লজ্জা লুকায়ে……ডঙ্কা বাজে,
(খ) জিজাবায়ে শুধু কহিল শিবাজী——তানাজী মালেশ্বর।

৫। অর্থ লিখ : প্রমত্ত, ধুমধাম, ম্রিয়মাণ, ঘৃণ্য, ডঙ্কা, তাণ্ডবে, বিবর, নির্জিত।

৬। বাক্যে প্রয়োগ কর : দূত, বজ্রকণ্ঠে, অগ্রসর, আগত, বিস্ময়হত, লাঞ্ছনা, ঘৃণ্য।

৭। গদ্যরূপ লিখ : বারতা, ঘনায়েছে, পরশি, জিনে, করিনু, ঘুচাব, পরান, পরশিরা।

৮। টীকা লেখ : তানাজী, শিবাজী, জিজাবাঈ

৯। মোটা হরফের পদগুলির কারক বিভক্তি নির্ণয় কর :
আপনার **মান পরেরে** বিকায়ে লাঞ্ছনাভরা **লাজে**
সিংহগড়ের **দুর্গে আজিকে** মোগল-ডঙ্কা বাজে।

———

পল্লী জননী

জসিম উদ্দিন



[এই কবিতাটিতে নীরব নিশীথে রোগ-জর্জর সন্তানের শিয়রে উপবিষ্টা তন্দ্রা-হারা পল্লীজননীর হৃদয়ের উদ্বেগ আশঙ্কার এক মর্মস্পর্শী ছবি চিত্রিত হইয়া ।]

রাত থম্ থম্ শব্দ নিঝুম, ঘনঘোর আঁধিয়ার,
নিশ্বাস পড়ে, তাও শোনা যায় নিঃসাড় চারিধার ।
ভন্ ভন্ ভন্ জমাট বেঁধেছে বুনো মশকের গান,
এঁধো ডোবা হ'তে বহিছে বাতাস পচানো পাতার ঘ্রাণ ।
ছোট কুঁড়েঘর বেড়ার ফাঁকেতে আসিছে শীতল বায়ু ।
শিয়রে বসিয়া মনে মনে মাতা গণিছে ছেলের আয়ু ।
নামাজের ঘরে মোমবাতি মানে, দরগায় মানে দান,
"ছেলেরে আমার ভাল ক'রে দাও"—কাঁদে জননীর প্রাণ ।
"ভাল ক'রে দাও আল্লা রছুল, ভাল ক'রে দাও পীর,"
কহিতে কহিতে বুকখানি ভাসে বহিয়া নয়ন-নীর ।
যে কথা ভাবিতে পরাণ শিহরে তাই ভাসে হিয়া-কোণে ।
'বালাই, বালাই ভাল হবে, বাছা'—স্বপ্নের জাল বোনে ।
কত কথা আজ মনে পড়ে, তার গরীবের সংসারে, ।
ছোটখাটো কত বায়না ছেলের পারে নাই মিটাবারে ।
ঘরের চালেতে ভুতুম ডাকিছে অকল্যাণ এ সুর,
মরণের দূত এল বুঝি হায়, হাঁকে মায়—'দূর—দূর'